

আন্নূর

২৪

নামকরণ

পঞ্চম রূক্ষের প্রথম আয়াত **اللَّهُ نَسْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি যে বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হ্যরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে এটি নাযিল হয়। (ইতীয় ও তৃতীয় রূক্ষে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহ্যাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরীতে আহ্যাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পরদার বিধান কুরআন মজিদের দুটি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং বিতীয়টি হচ্ছে সূরা আহ্যাব। আর আহ্যাব যুদ্ধের সময় সূরা আহ্যাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কাজোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহ্যাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দীড়ায় যে, পরদার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহ্যাবে নাযিলকৃত নির্দেশসম্বহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহ্যাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পরদার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে বৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরী মনে করি।

ইবনে সাদ বর্ণনা করেন বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই খিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহ্যাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ হচ্ছে এই যে, হ্যরত আয়েশা (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোন কোনটিতে হ্যরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) ও হ্যরত সা'দ ইবনে মু'আয়ের ইতিকাল হয় বনী কুরাইয়া যুদ্ধে। আহ্যাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিতি থাকার কোন সঙ্গবনাই নেই।

অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহ্বাব যুক্ত ৫ হিজরীর শুওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনীল মুস্তালিকের যুক্ত হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পরদার বিধান নাযিল হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহ্যাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লামের বিষয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং এ বিষয়ে ৫ হিজরীর যিল্কদ মাসের ঘটনা। সূরা আহ্যাবে এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত যয়নবের (রা) বোন হামনা বিনতে জাহশ হযরত আয়েশা (রা) বিরুদ্ধে অপবাদ হড়ানোয় শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সা'দ ইবনে মু'আয়ের (রা) উপস্থিতির বর্ণনা ধাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবাব পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয়ের কথা বলা হয়েছে আবার কোনটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে হযরত উসাইদ ইবনে হাদাইরের (রা) কথা, এ জিনিসটাই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়েশা বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপখায়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আয়ের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি বনীল মুস্তালিক যুক্ত ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহ্বাব ও কুরাইয়া যুক্তের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও যয়নবের (রা) বিষয়ের ঘটনা তাঁর পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রহী উন্মোচন করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অর্থে কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যয়নবের (রা) বিষয়ে ও হিজাবের হকুম আহ্বাব ও কুরাইয়ার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হায়ম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি।

প্রতিহাসিক পটভূমি

এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হবার পর যে, সূরা নূর ৬ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহ্বাবের কয়েক মাস পর নাযিল হয়, যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তাঁর ওপর আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেয়া উচিত। বদর যুক্তে জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী আন্দোলনের যে উখান শুরু হয় খন্দকের যুক্ত পর্যন্ত পৌছুতেই তা এত বেশী ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশর্রিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দোমনা সংশয়ী নির্বিশেষে সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অন্ত ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরামর্শ করা যেতে পারে না। খন্দকের মুক্তি তাঁর এক জোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনা উপকর্তে এক মাস ধরে মাথা

কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দেন :

لَنْ تَغْزُوكُمْ قُرِيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا وَلَكُنْكُمْ تَغْزِيْنَهُمْ

“এ বছরের পর কুরাইশুর আর তোমদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের ওপর হামলা করবে।” (ইবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

রসূল (সা)-এর এ উচ্চি শারী প্রকারাত্মকে একধাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিভাগী শক্তির অগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার থেকে ইসলাম আর আত্মরক্ষার নয় বরং অগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি হিল অবহার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্বের প্রতিপক্ষও তালোভাবে এটা অনুভব করছিল।

মুসলমানদের সম্মত্য ইসলামের এ উভয়োভ্যর উভাতির আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুক্ত কাফেররা তাদের চাইতে বেশী শক্তির সমাবেশ ঘটায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর হিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদের উভয় মানের অসম্ভাবন এ উভাতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অর্থ-শক্তি ও যুক্তের সাজ-সরঞ্জামে কাফেরদের পাণ্ডা ভারী ছিল। অর্বনেতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমস্ত আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবহা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পুরাতন ব্যবহার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবহায় যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক প্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শক্তিদলই এটা অনুভব করছিল। একদিকে তারা দেখছিল নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে। অন্যদিকে তারা পরিকার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবহারণা যুক্ত ও শাস্তি উভয় অবহায়ই পরাজয় বরণ করে চলছে।

নিকৃষ্ট বর্তাবের শোকদের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের শুণাবলী ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিকারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সংগুণাবলী তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ-ক্রটিগুলো তাদেরকে নিষ্পগামী করছে তখন তাদের মনে নিজেদের ক্রটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের শুণাবলীর আয়ত্ত করে নেবার চিন্তা জাপে না, বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেতাবেই হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও তুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অগ্রসরার চালাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের যত শুণই ধাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ-ক্রটিও আছে। এ হীন

মানসিকতাই ইসলামের শক্তিদের কর্মতৎপরতার গতি সামরিক কার্যক্রমের দিক থেকে সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শক্তিদের তুলনায় মুসলমানদের তেজেরের মুনাফিকরা সূচারুরূপে সম্পর্ক করতে পারতো তাই পরিকল্পিতভাবে বা পরিকল্পনা ছাড়াই হিঁরিকৃত হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা তেজের থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা বাইর থেকে তার ফলে যত বেশী পারে শাতবান হবার চেষ্টা করবে।

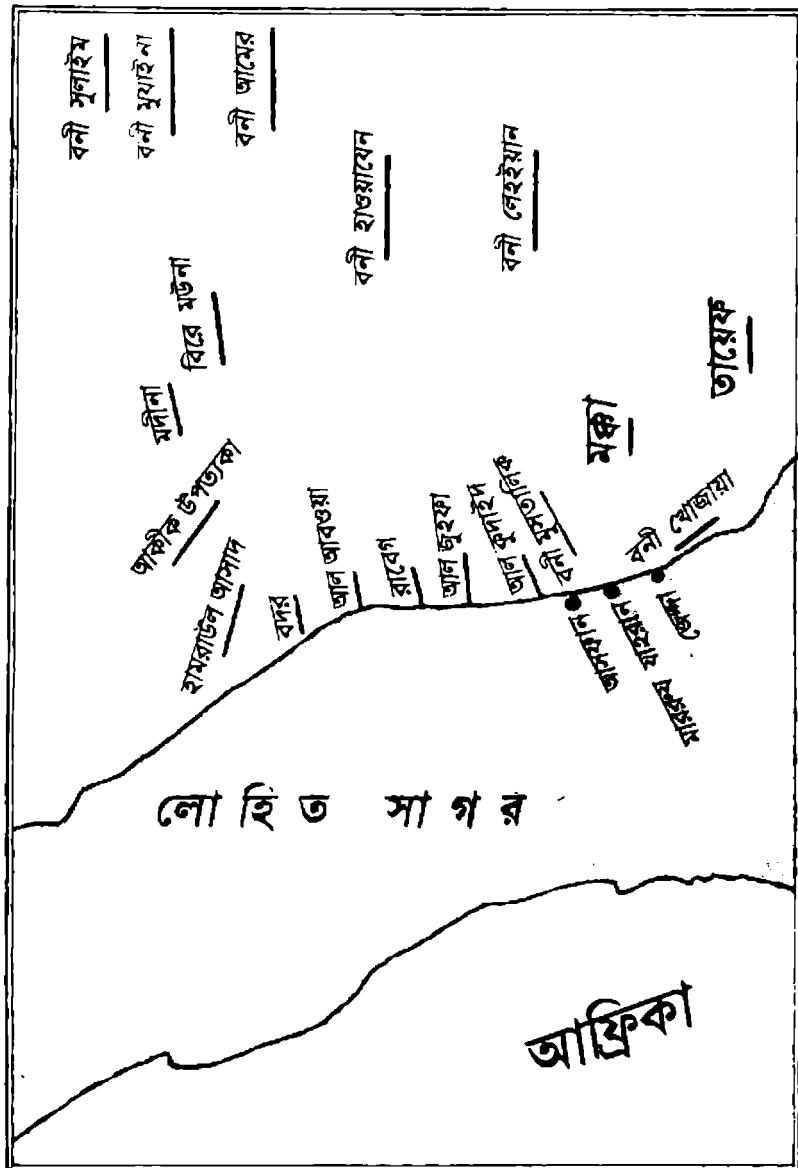
৫ হিজরী খিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালক পুত্র* সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের [যায়েদ (রা) ইবনে হারেসা] তালাক দেয়া স্বীকে [য়য়নব (রা)] বিনতে জাহশ। বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপচারের এক বিরাট তাঙ্গুব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কঠে কঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রঞ্চাতে শুরু করে। তারা অসুত অসুত সব গুরু তৈরী করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালক পুত্রের স্বীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউয়ুবিল্লাহ)। কিভাবে পুত্র তাঁর প্রেমের ব্যবর পেয়ে যায় এবং তার পর নিজের স্বীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন। এ গুরুগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেন। এ কারণে মুহাম্মদ ও মুফাস্সিরদের একটি দল হযরত য়য়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গ়ম্বের অংশ পাওয়া যায়। পচিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন করেছেন। অথচ হযরত য়য়নব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুরুর (উমাইয়াহ বিনতে আবদুল মুত্তাসিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঢোকের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং নাউয়ুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী (সা) নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে হযরত যায়েদকে (রা) বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত য়য�়নব (রা) নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক প্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত পোলামের পত্নী হওয়াকে ব্রতাবতই মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্যই হযরত য়য়নবকে (রা) এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বক্তৃ ও শক্ত সবাই জানতো। আর এ কথাও সবাই জানতো, হযরত য়য়নবের বক্তৃয় আভিজাত্যবোধই তাঁর ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এসব সম্বেদ নির্মজ মিথ্যা অপবাদকারীয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জ্বল্য ধরনের নৈতিক দোষান্তে করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

* অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেয়া এবং পরিবারের মধ্যে তাকে পুরোপুরি ঔরশজ্বাত সংস্কারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

এরপর হিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুস্তালিক যুক্তের সময়। প্রথম হামলার চাইতে এটি ছিল বেশী মারাত্মক। বনীল মুস্তালিক গোত্রটি বনী খুয়া'আর একটি শাখা ছিল। তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেছা ও রাবেগের মাঝখানে কুদাইদ এলাকায়। যে বরণাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল মুরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী'র মুদ্ধও বলা হয়েছে। চিত্রের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থানস্থল জানা যেতে পারে।

৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান, তারা মুসলমানদের ওপর হামলার প্রযুক্তি নিষে এবং অন্যান্য উপাজ্ঞাকেও একজ করার চেষ্টা করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ষড়যজ্ঞটিকে অকুরেই গুড়িয়ে দেবার জন্য একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান। এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তাঁর সহযোগী হয়। ইবনে সাঁদের বর্ণনা মতে, এর আগে কোন যুক্তেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়ানি। মুরাইসী নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সা) হঠাৎ শক্রদের মুখেয়ুমুখি হন। সামান্য সংবর্হের পর যাবতীয় সম্পদ-সরঞ্জাম সহকারে সমগ্র গোত্রটিকে ঘেফতার করে নেন। এ অভিযান শেষ হবার পর তখনে মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এবন সহয় একদিন হ্যরত উমরের (রা) একজন কর্মচারী (জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারী) এবং খায়রাজ গোত্রের একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন আনসারদেরকে ঢাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ঢাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে লোকেরা একজ হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের খায়রাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিনকে তাঙ করে দেয়। সে আনসারদেরকে একথা বলে উত্সুকিত করতে থাকে যে, “এ মুহাজিররা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং এ কুরাইশী কাঙ্গালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কৃকুরকে লালন পালন করে বড় করো যাতে সে তোমাকেই কামড়ায়। এসব কিন্তু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে ঢেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছে এবং নিজেদের ধন-সম্পত্তিতে তাদেরকে অঙ্গীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে!” তারপর সে কসম থেঁয়ে বলে, “মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পন্ন তারা দীন-ইন-লাহিডেরকে বাইরে বের করে দেবে।”* তার এসব কথাবার্তার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছলে হ্যরত উমর (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **فَكَيْفَ يَا عُمَرُ تُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ مُحَمَّداً** : (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজেরই সংগী-সাথীদেরকে হত্যা করছে।) তারপর তিনি তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুক্ম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত কোথাও থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশী ক্রান্ত হয়ে গড়ে এবং কাঠোর এক জায়গায় বসে গঞ্জগুজ করার এবং অন্যদের তা পোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদাইর

* স্মৃত মুনাফিকদের আল্লাহ নিজেই তার এ উকিটি উদ্ভূত করেছেন।



বনীল মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা

(রা) বলেন, “হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি নিজের স্বাতাবিক নিয়মের বাইরে অসময়ে রাওয়ানা হবার হক্ক দিয়েছেন?” তিনি জবাব দেন, “তুমি শোননি তোমাদের সার্বী কিসব কথা বলেছে?” তিনি জিজেস করেন, “কোন্ সার্বী?” জবাব দেন, “আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।” তিনি বলেন, “হে আল্লাহর রসূল! এই বাক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মৃক্ষট তৈরী হচ্ছিল। আপনার আগমনের ফলে তার বাড়া তাতে ছাই পড়েছে। তারই ঘাল সে বাড়েছে।”

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে থায়নি। এরি মধ্যে একই সফরে সে আর একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। এ এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সহযোগিতা এবং জ্ঞান ও বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো যারাত্তুক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে যিখ্তা অপবাদের ফিত্না। এ ঘটনার বিবরণ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা যাবে। যাবখানে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে সেগুলো আমি অন্যান্য নির্তরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাকেটের মধ্যে সন্নিবেশিত করে যেতে থাকবো। এর ফলে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। তিনি বলেন :

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্নানের মধ্য থেকে কে তাঁর সঙ্গে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।” বনীল মুস্তালিক যুক্তের সময় লটারীতে আমার নাম উঠে। ফলে আমি তাঁর সার্বী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনমিলে রত্তিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রাওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারাটি ছিড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তাঁর ঘোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রাওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রাওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কর খাবার কারণে বড়ই হালকা পাত্তা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তাঁর মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেন। তাঁরা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রাওয়ানা হয়ে

- এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিল না। আসলে সকল ঝীর অধিকার সমান ছিল। তৌদের একজনকে অন্য জনের ওপর ধারান্ব দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কাটিকে বেছে নিতেন তাহলে ঝীর মনে ব্যাখ্যা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেখাবেষি ও বিহেব সৃষ্টির আশঙ্কা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করতেন। শরীরাতে এমন সব অবস্থার জন্য লটারী করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারেই সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অধিকার দেবার কোন ন্যায়সংলত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবলমাত্র একজনকেই দেয়া যেতে পারে।

যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পরদার হকুম নাফিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস।* তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন সুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন।) আমাকে দেখে তিনি উট ধায়িয়ে নেন এবং স্বত্ত্বার্তাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, **أَنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্তুর্তী এখনে রয়ে গেছেন?" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সংগে সংগেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনায় কুচক্ষীরা যিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময় সফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে হয়েরত আয়েশা (রা) সেনা শিবিরে এসে পৌছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিকার করে উঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিকলত্ব অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্তুর্তী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ যিথ্যা অপবাদের ব্যব ছাড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেক কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচ্ছে করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজেস করতেন, (ও কেমন আছে?)

* আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তাঁর স্তুর্তী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর বিরুক্তে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজ্জের নামাব যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার পারিবারিক ঝোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একবার রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাবে, সংগে সংগেই নামাব পড়ে নেবে। কোন কোন মূহাদিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিগুলি মূহাদিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কামোর কোন জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন।

নিজে আমার সাথে কোন কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিচয়ই কোন ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গেলাম, যাতে তিনি আমার সেবা শুধুমাত্র তালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিস্তাহ ইবনে উসাসার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ হয়েরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সন্দেশ মিস্তাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা হয়েরত আয়েশা (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাত্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সংগে সংগে স্বতন্ত্রভাবে বলে উঠেন : “ক্ষম হোক মিস্তাহ।” আমি বললাম, “তালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুক্তে অংশ নিয়েছে।” তিনি বলেন, “মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?” তারপর তিনি গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কিসব কথা রঞ্চিয়ে বেড়াচ্ছে। মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে থেকেও যারা এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিস্তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্সান ইবনে সাবেত ও হয়েরত যয়নবের (রা) বোন হাম্মানা বিনুতে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।”

সামনের দিকে এগিয়ে হয়েরত আয়েশা (রা) বলেন : “আমি চলে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা) ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে (রা) ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ (রা) আমার পক্ষে তালো কথাই বলে। সে বলে, ‘হে আল্লাহর রসূল! তালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।’ আর আলী (রা) বলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বৌদীকে দেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।’ কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, ‘সে আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অঙ্গলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোন কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা। একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।’ সেদিনই রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বলেন, ‘হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তাঁর আক্রমণ থেকে আমার ইঞ্জত বীচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া

হচ্ছে।' সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতেও আসেনি।' একথায় উসাইদ ইবনে হুদাইর (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী 'দ ইবনে মু'আয়*) উঠে বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি আমাদের ভাই খায়রাজদের লোক হয় তাহলে আপনি হকুম দিন আমরা হকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত।' একথা শুনতেই খায়রাজ প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, 'মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এ জন্যই মুখে আনছো যে সে খায়রাজদের অতরভুক। যদি সে তোমাদের গোত্রের লোক হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে না, আমরা তাকে হত্যা করবো।'" উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।' একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাণ্ডামা শুরু হয়ে যায়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিহরে বসে ছিলেন। মসজিদের মধ্যেই আওস ও খায়রাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি মিহর থেকে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশা (রা) অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমি এতদস্থক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ক্রটি মৃত্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আমি যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদ রটিয়ে একই শুল্লিতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিন্ধীকের (রা) ইঞ্জতের শুপরি

* সম্ভবত নামের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) নাম উদ্ভেদ করার পরিবর্তে আওস সরদার শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন। কোন বর্ণনাকারী এ থেকে সা'দ ইবনে মু'আয় মনে করেছেন। কারণ নিজের জীবন্ধশায় তিনিই ছিলেন আওস গোত্রের সরদার এবং ইতিহাসে আওস সরদার হিসেবে তিনিই বেশী পরিচিত। অথচ আসলে এ ঘটনার সময় তাঁর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর ছিলেন আওসের সরদার।

** হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ যদিও অত্যন্ত সৎ ও মুখ্লিস মুসলমান ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁগোবাসা পোষণ করতেন এবং মদীনায় যাদের সাহায্যে ইসলাম বিস্তার শান্ত করে তাদের মধ্যে তিনিও একজন উদ্দেশ্যহোগ্য ব্যক্তিত্ব ত্বরণ এতসব সৎ শুণ সন্তোষ তাঁর মধ্যে ব্রজতিপ্রীতি ও জ্ঞাতীয় বৰ্খবৰ্ধে (আর আরবে সে সময় জাতি বলতে গোত্রই বুঝাতো) ছিল অনেক বেশী। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যেহেতু সে ছিল তাঁর গোত্রের লোক। এ কারণেই মুক্তি বিজয়ের সময় তাঁর মুখ থেকে এককা বের হয়ে যায় : **اللَّيْلَ يَوْمُ الْمَحْمَةِ، الْيَوْمُ تَسْتَحْلِمُ الْحَرَمَ** (আজ হত্যা ও রক্ত প্রবাহের দিন। আজ এখানে হারামকে হালাল করা হবে।) এর ফলে দ্রোধ প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ঝাতা ফিরিয়ে নেন। আবার এ কারণেই তিনি রসূলুল্লাহর (সা) ইন্ডিকালের পর সাকীফায়ে বনি সায়েদায় খিলাফত আনসারদের হক বলে দাবী করেন। আর যখন তাঁর কথা অ্যাহ করে আনসার ও মুহাজির সবাই সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকরের (রা) হাতে বাইআত করেন তখন তিনি একাই বাই'আত করতে অবীকার করেন। আমজ্ঞা তিনি কুমাইলী খলীফার খিলাফত বীকার করেননি। (দেখুন আল ইসাবাহ লিইবনে হাজার এবং আল ইস্তিআব লিইবনে আবদিল বার এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১)

হামলা চালায়। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের উন্নততর নেতৃত্ব মর্যাদা ও চারিত্রিক ভাবমূর্তি স্ফুর করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগ্রিমিকা প্রজন্মিত করে যে, যদি ইসলাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে না ফেলে থাকতো তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র পরম্পর দড়াই করে খৎস হয়ে যেতো।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বিষয়

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে পথম হামলার সময় সূরা আহ্যাবের শেষ ৬টি ইচ্ছুক' নাযিল হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাযিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে তা তালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাহিল যেটা ছিল তাদের প্রাণন্ত্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ তাদের চরিত্র ইনন্মূলক অপবাদ রটনার অভিযানের বিরুদ্ধে একটি দ্রুত তাষণ দেবার বা মুসলমানদেরকে পান্টা আক্রমণে উত্তুল করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবন্ধ করেন যে, তোমাদের নেতৃত্বিক অংগনে যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুলো পূর্ণ কর এবং এ অংগনকে আরো বেশী শক্তিশালী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যহুনবের (রা) বিয়ের সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাঙ্গামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহ্যাব বের করে পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাঙ্গামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নিষ্পত্তিক্ষিত নির্দেশগুলো দেয়া হয় :

এক : নবী করীমের (সা) পবিত্র স্তুগণকে হকুম দেয়া হয় : নিজেদের গৃহমধ্যে মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং তিনি পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে বিনম্ব বরে কথা বলো না, যাতে কোন ব্যক্তি কোন অবাহিত আশা পোষণ না করে বসে। (৩২ ও ৩৩ আয়াত)

দুই : নবী করীমের (সা) গৃহে তিনি পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পরদার আড়ান থেকে চাইতে হবে। (৫৩ আয়াত)

তিনি : গায়ের মাহুরাম পুরুষ ও মাহুরাম আজ্ঞায়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হকুম দেয়া হয়েছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহুরাম আজ্ঞায়রাই স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন। (৫৫ আয়াত)

চার : মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়, নবীর স্তুগণ তোমাদের মা এবং একজন মুসলমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তাঁর আপন মায়ের মতই হারাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে। (৫৬ ও ৫৮ আয়াত)

পাঁচ : মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দেয়া দুনিয়ায় ও আখেরোত্তে আল্লাহর লানত ও লাক্ষ্মনাকর আ্যাবের কারণ হবে এবং এভাবে

কোন মুসলমানের ইঞ্জতের ওপর আক্রমণ করা এবং তার ভিস্তিতে তার ওপর অথবা দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহের শাখিল। (৫৭ ও ৫৮ আয়াত)

ছয় : সকল মুসলমান মেয়েকে হকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে। (৫৯ আয়াত)

তারপর যখন হ্যরত আয়েশার (রা) বিরলক্ষে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় মদীনার সমাজে একটি হাঁগামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাযিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথার্থ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে এখানে আমি সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্ধিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের সংশোধন ও সংগঠনের জন্য কি ধরনের আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করার বিধান দেয়, তা পাঠক অনুমান করতে পারবেন :

(১) যিনা, ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা : ১৫ ও ১৬ আয়াত) এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(২) ব্যক্তিক পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হকুম দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়।

(৩) যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণবন্ধন সাক্ষী পেশ করতে পারে না তার শাস্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(৪) স্বামী যদি স্ত্রীর বিরলক্ষে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য "ল'আন"-এর রীতি প্রবর্তন করা হয়।

(৫) হ্যরত আয়েশার (রা) বিরলক্ষে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে কোন ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরলক্ষে যে কোন অপবাদ দেয়া হোক, তা চোখবুজ্জে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের শুভ যদি রটে যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া এবং তার পথ রোধ করা উচিত। এ প্রসংগে নীতিগতভাবে একটি কথা বৃক্ষিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই দিবাহিত হওয়া উচিত। নষ্টা ও ভুষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আজ্ঞা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভুষ পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রসূলকে (সা) একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভুষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গী হতে পারতো? যে নারী কার্যত ব্যক্তিকারে পর্যন্ত লিঙ্গ হয়ে যায় তার সাধারণ চালচলন কিভাবে

এমন পর্যায়ের হতে পারে যে, রসূলের মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব তার সাথে এভাবে সংসার জীবন যাপন করেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থীক লোক একটি বাজে অপবাদ কারোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না, উপরত্ব তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেলে দেখতে হবে। অপবাদ কে লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে?

(৬) যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসলিম সমাজে নেতৃত্বে বিরোধী ও অশ্রীল কার্যকলাপের প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।

(৭) মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপেক্ষ মনে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।

(৮) লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে নিসংকোচ প্রবেশ করো না বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

(৯) নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে দেখতে ও উকিবৃকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়।

(১০) মেয়েদের হকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা ও বুক ঢেকে রাখো।

(১১) মেয়েদের নিজেদের মাহুরাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর সামনে সাজগোজ করে না আসার হকুম দেয়া হয়।

(১২) তাদেরকে এ হকুমও দেয়া হয় যে, বাইরে বের হলে শুধু যে কেবল নিজেদের সাজসজ্জা লুকিয়ে বের হবে তাই না বরং এমন অলংকার পরিধান করেও বাইরে বের হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে।

(১৩) সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবুড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়। হকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি বাদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব অশ্রীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্রীলতার সহজ শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শেনার এবং তা ছড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে।

(১৪) বাদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য "মুকাতাব"-এর পথ বের করা হয়। (মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়া) মালিকরা ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাদী ও গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হকুম দেয়া হয়।

(১৫) বাদীদেরকে অর্থোপার্জনের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাদীদের মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

(১৬) পারিবারিক জীবনে গৃহ পরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্য নিয়ম করা হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতে) গৃহের কোন পুরুষ ও মেয়ের কামরায় আক্ষিকতাবে চুক্তে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করায় অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(১৭) বৃত্তীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে উড়না নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু “তাবারুজ্জ” (নিজেকে দেখাবার জন্য সাজসজ্জা করা) থেকে দূরে থাকার হকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নিসিহত করা হয়েছে, বার্ধক্যাবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে ভাগো।

(১৮) অঙ্ক, খঞ্জ, পংগু ও ঝুঁপকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে কোথাও থেকে কোন খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে না। এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

(১৯) নিকট আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে থেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ের যেমন তারা নিজেদের বাড়িতে থেতে পারে। এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মেহ-ভালোবাসা-মায়া-মহতা বেড়ে যাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্র বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোন কুচক্ষী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো।

এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মু’মিনদের এমনসব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পর্ক মু’মিন কে এবং মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আরো কতিপয় নিয়ম-কানূন তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টকর দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা।

এ সমগ্র আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর হামলার জ্বাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিটেফোটাও নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন এবং অন্যদিকে সূরার বিষয়বস্তু ও বাকরীতি দেখুন। এ ধরনের উভেজনাকর পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংক্ষারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ত নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই পাওয়া যায় না যে, ফিত্নার মোকাবিলায় কঠিন থেকে কঠিনতর উভেজক পরিস্থিতিতে আমাদের কেমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উদার হ্বয়ে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এগিয়ে যেতে হবে বরং এ থেকে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্ত্বার অবতীর্ণ বাণী যিনি অনেক উচ্চ স্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সন্তান এসব অবস্থা ও জীবনচারের প্রভাবমূল্ক থেকে নির্জনা পথনির্দেশনা ও বিধান দানের

দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণী হতো তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও নিজের ইঞ্জত আবরণের ওপর জ্যুন্য আক্রমণের ধারা বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র গোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্যভাবে যে স্বাতান্ত্রিক উদ্দেশ্যনার সূচি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রত্বাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

আয়াত ৬৪

রক্ত ১

সূরা আন নূর-মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মান্বয় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ أَنْزَلْنَا وَفَرَضْنَا فِيهَا أَيْمَانَ بَيْنَ يَدَيْنِ لِعَالَمٍ
 تَذَكَّرُونَ ① إِلَّا رَأَيْتَ وَالرَّأْيَ فَاجْلِدْ وَأَكْلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِائَةَ
 جَلَدٍ ② وَلَا تَأْخُلْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مُرْتَقِي مِنْ
 بِاللَّهِ وَإِلَيْهِ الْأُخْرَى ③ وَلَيَشْهَدْ عَنْ أَبْهَمَ مَا طَأْفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ④

এটি একটি সূরা, আমি এটি নাযিল করেছি এবং একে ফরয করে দিয়েছি আর এর মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ নাযিল করেছি,^১ হয়তো তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো।^২ আর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো।^৩ আর তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় মু’মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।^৪

১. এসব বাক্যাংশের মধ্যে “আমি”র উপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আর কেউ এটি নাযিল করেনি বরং “আমিই” নাযিল করেছি। তাই কোন শক্তিহীন উপদেশকের বাণীর মতো একে হাল্কা জিনিস মনে করে বসো না। তালো করে জেনে রাখো, এমন এক সন্তোষ এটি নাযিল করেছেন যার মুঠোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রাণ ও কিসমত এবং তোমরা মরেও যার পাকড়াও থেকে বাচতে পারবে না।

বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো “সুপারিশ” পর্যায়ের জিনিস নয়। তোমার ইচ্ছা হলে মেনে নিলে অন্যথায় যা ইচ্ছা তাই করতে থাকলে, ব্যাপারটা তেমন নয়। বরং এটি হচ্ছে অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধান। এ বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। যদি তুমি মু’মিন ও মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে এ বিধান অনুযায়ী কাজ করা তোমার জন্য ফরয।

তৃতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। পরিকার ও সুস্পষ্ট নির্দেশনামা। এগুলো সম্পর্কে তোমরা এ ওজর পেশ

করতে পারবে না যে, অমুক কথাটি বুঝতে পারিনি কাজেই সেটিকে কেমন করে কার্যকর করতাম?

যে মহান ঘোষণার পরে আইনগত বিধান শুরু হয়ে যায় এটি হচ্ছে তার প্রার্থিকা (Preamble)। সূরা নূরের বিধানগুলো মহান আশ্চর্ষ কর প্রদর্শ সহকারে পেশ করছেন এ ভূমিকার বর্ণনাভূক্তি নিজেই তা আনিয়ে দিচ্ছে আইন-বিধান সঠিকত অন্য কোন সূরার ভূমিকা এত বেশী প্রেরণদার নয়।

২. এ বিষয়টির অনেকগুলো আইনগত, নৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক থাব্যা সাপেক্ষে রয়ে গেছে। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া বর্তমান যুগে এক ব্যক্তির জন্য আশ্চর্ষ এ শরীয়াতী বিধান অনুধাবন করা কঠিন। তাই নিচে আমি এর বিভিন্ন দিকের উপর ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করবো :

একঃ যিনা বা ব্যক্তিগুলোর যে সাধারণ অর্থটি প্রত্যেক ব্যক্তি ধরেন সেটি হচ্ছে এই যে, “একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে কোন বৈধ দাপ্তর্য সম্পর্ক হচ্ছেই পরম্পরার মৌল মিলন করে।” এ কাজটির নৈতিকভাবে খারাপ হওয়া অথবা ধৰ্মীয় দিক দিয়ে পাপ হওয়া কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে দুর্বলীয় ও অপস্তুকর হওয়া এমন একটি জিনিস যে ব্যাপারে প্রাচীনতম যুগ থেকে নিয়ে আস পর্যন্ত সকল মানব সমাজ ঐক্যত্ব পোষণ করে আসছে। কেবলমাত্র বিহিন করেকেজন গোক যারা নিজেদের বুরুষত্বকে নিজেদের প্রত্যঙ্গ নীতির অধীন করে দিয়েছে অথবা যারা নিজেদের উন্নত মতিক্ষের অভিনব ব্যবাগকে দাশনিক তত্ত্ব মনে করে নিয়েছে তারা ছাড়া অর কেউই আস পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেনি। এ বিশ্বজনীন ঐক্যত্বের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রকৃতি নিজেই যিনা হারাম হওয়ার দাবী দানায়, মানব জাতির অতিকৃতি ও স্থায়িত্ব এবং মানবিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। উভয়ই এ বিষয়টির উপর নির্ভর করে যে, নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র আনন্দ উপতোগের জন্য মিলিত হবার এবং তারপর আবাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে খেঁজুচারী হবে না বরং প্রত্যেকটি ছোড়ার পারম্পরিক সম্পর্ক এমন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার ও চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যা সমাজের সবাই জানবে এবং সবার পাশে হবে পরিচিত এবং এ সংগে সমাজ তার নিচ্ছতাও দেবে। এ অঙ্গীকার ও চুক্তি হচ্ছে মানুষের বৃৎধারা এক দিনের মানুষে চাপ্পতে পারে না। কারণ মানব শিশু নিজের জীবন ও নিজের বিকাশের জন্য বহুরে পর বাহরের সহানুভূতিশীল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্যো-প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষে হয়। যে পূর্বস্থি এ শিশুর দুনিয়ায় অঙ্গিত্ব লাভের কারণ হচ্ছে যতক্ষণ না সে নারীর সাথে সহযোগিতা করবে ততক্ষণ কোন নারী একাকী এ বোৰা বহন করার জন্য কখনো তৈরী হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ চুক্তি হচ্ছে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিও টিকে ধাকতে পারে না। কারণ সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত তো একটি পুরুষ ও একটি নারীর সহ অবস্থান দ্বারা, গৃহ ও পরিবারের অঙ্গিত্ব দান করার এবং তারপর পরিবারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যদি নারী ও পুরুষ গৃহ ও পরিবার গঠন না করে নিছক আনন্দ উপতোগের জন্য স্বাধীনভাবে সহ অবস্থান করতে থাকে তাহলে সমস্ত মানুষ বিশ্বিষ্ট হয়ে পড়বে। সমাজ জীবনের ভিত্তি চূর্ণ ও বঙ্গন ছিল হয়ে যাবে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ ইমারত যে ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে তার অঙ্গিত্বই বিস্তৃত হয়ে যাবে। এসব কারণে নারী

ও পূর্ণমের যে স্বাধীন সম্পর্ক কোন সুপরিচিত ও সর্বসমত বিশ্বস্তার চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় তা মূলত মানবিক প্রকৃতির বিরোধী। এসব কারণেই প্রতি যুগে মানুষ একে মারাত্মক দোষ, বড় ধরনের অসদাচার ও ধর্মীয় পরিভাষায় একটি কঠিন গোনাহ ঘনে করে এসেছে এবং এসব কারণেই প্রতি যুগে মানব সমাজ বিয়ের প্রচলন ও প্রসারের সাথে সাথে যিনা ও ব্যক্তিগতের পথ বক্ষ করার জন্য কোন না কোনভাবে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন-কানুন এবং নৈতিক, তামাদুনিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। জাতি ও সমাজের জন্য যিনার ক্ষতিকর হবার চেতনা কোথাও কম এবং কোথাও বেশী, কোথাও সুস্পষ্ট আবার কোথাও অন্যান্য সমস্যার সাথে জড়িয়ে অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

দুই : যিনার হারাম হবার ব্যাপারে একমত হবার পর যে বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে সেটি হচ্ছে, এর অপরাধ অর্থাৎ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার ব্যাপারটি। এখান থেকেই ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইনের বিরোধ শুরু হয়। যেসব সমাজ মানব প্রকৃতির কাছাকাছি থেকেছে তারা সবসময় যিনা অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে একটি অপরাধ হিসেবে দেখে এসেছে এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ধারা যতই সমাজকে খারাপ করে চলেছে এ অপরাধ সম্পর্কে ততই মনোভাব কোমল হয়ে চলেছে।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করা হয় সেটি ছিল : “নিছক যিনা” (Fornication) এবং “পর নারীর সাথে যিনা” (Adultery) এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটিকে সামান্য ভুল এবং কেবলমাত্র শেষেকৃটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়।

নিছক যিনার যে সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, “কোন অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী নয়।” এ সংজ্ঞায় মূলত পুরুষের নয় বরং নারীর অবস্থার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। নারী যদি স্বাধীন হয় তাহলে তার সাথে সংগম নিছক যিনা হবে। এ ক্ষেত্রে সংগমকারী পুরুষের স্ত্রী থাক বা না থাক। তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও তারতের আইনে এর শাস্তি ছিল খুবই হাল্কা পরিমাণের। গ্রীস ও রোমও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীরাও এ থেকে প্রভাবিত হয়। বাইবেলে একে শুধুমাত্র এমন একটি অন্যায় বলা হয়েছে যার ফলে পুরুষকে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডই দিতে হয়। যাত্রা পুনর্ক্ষে এ সম্পর্কে যে হকুম দেয়া হয়েছে তার শব্দাবলী নিম্নরূপ :

“আর কেহ যদি অবাগদন্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে।” (২২:১৬-১৭)

“দ্বিতীয় বিবরণে” এ হকুমটি কিছুটা অন্য শব্দাবলীর সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর বলা হয়েছে, পুরুষের কাছ থেকে পঞ্চাশ শেকল (প্রায় ২০ তোলা) পরিমাণ রৌপ্য

০"

কন্যার পিতাকে জরিমানা দেবে। (২২:২৮-২৯) তবে কোন ব্যক্তি যদি পুরোহিতের মেয়ের সাথে যিনা করে তাহলে তার জন্য ইহুদী আইনে রয়েছে ফাসি এবং মেয়েকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা। (Everyman's Talmud, p. 319-20)

এ চিন্তাটি হিন্দু চিন্তার সাথে কত বেশী সামঞ্জস্যশীল তা অনুমান করার জন্য মনু সংহিতার সাথে একবার মিলিয়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে :

"যে ব্যক্তি নিজের জাতের কুমারী মেয়ের সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে সে কোন শাস্তি লাভের যোগ্য নয়। মেয়ের বাপ রাজী থাকলে সে বিনিময় দিয়ে তাকে বিয়ে করে নেবে। তবে মেয়ে যদি উচ্চ বর্ণের হয় এবং পুরুষ হয় নিম্নবর্ণের, তাহলে মেয়েকে গৃহ থেকে বের করে দেয়া উচিত এবং পুরুষের অংগচ্ছেদের শাস্তি দিতে হবে।" (৮ : ৩৬৫-৩৬৬) আর মেয়ে ব্রাহ্মণ হলে এ শাস্তি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার শাস্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। (৩৭৭ প্লোক)।

আসলে এ সমস্ত আইনে পরন্তৰীর সাথে যিনা করাই ছিল বড় অপরাধ। অর্থাৎ বর্থন কোন (বিবাহিত বা অবিবাহিত) ব্যক্তি এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন ব্যক্তির স্ত্রী। এ কর্মটির অপরাধ হবার ভিত্তি এ ছিল না যে, একটি পুরুষ ও একটি নারী যিনা করেছে। বরং তারা দু'জন মিলে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এমন একটি শিশু জনন পালন করার বিপদে ফেলে দিয়েছে যেটি তার নয়, এটি ছিল এর ভিত্তি। অর্থাৎ যিনা নয় বরং বংশধারা মিশণের আশঁকা এবং একের স্তুতানকে অন্যের অর্থে প্রতিপালন করা ও তার উত্তরাধিকার হওয়াই ছিল অপরাধের মূল ভিত্তি। এ কারণে পুরুষ ও নারী উভয়েই অপরাধী সাব্যস্ত হতো। মিসরীয়দের সমাজে এর শাস্তি ছিল পুরুষটিকে শাঠি দিয়ে তালোমত্তে পিটাতে হবে এবং মেয়েটির নাক কেটে দিতে হবে। প্রায় এ একই ধরনের শাস্তির প্রচলন ছিল ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও প্রাচীন ইরানেও। হিন্দুদের মধ্যে নারীর শাস্তি ছিল, তার ওপর কুকুর পেলিয়ে দেয়া হতো এবং পুরুষের শাস্তি ছিল, তাকে উত্তু লোহার পালঁকে শুইয়ে দিয়ে চারাদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। গ্রীস ও রোমে প্রথম দিকে একজন পুরুষের অধিকার ছিল যদি সে নিজের স্ত্রীর সাথে কাউকে যিনা করতে দেখে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারতো অথবা ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে অর্ধদণ্ড নিতে পারতো। তার পর প্রথম বৃষ্টপূর্বাবে সীজার আগস্টিস এ আইন জারি করেন যে, পুরুষের সম্পত্তির অর্ধাংশ বাজেয়াও করে তাকে দেশান্তর করে দিতে হবে এবং নারীর অর্ধেক মোহরানা বাতিল এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বাজেয়াও করে তাকেও দেশের কোন দূরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে। কনষ্টান্টিন এ আইনটি পরিবর্তিত করে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেন। লিও (Leo) ও মারসিয়ানের (Marcian) যুগে এ শাস্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর সীজার জাটিনীন এ শাস্তিটি আরো হাল্কা করে এ নিয়ম জারি করেন যে, মেয়েটিকে বেত্রাঘাত করার পর কোন সন্যাসীর অংশমে দিয়ে আসতে হবে এবং তার স্বামীকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, সে চাইলে দু'বছর পর তাকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারে অন্যথায় সারা জীবন সেখানে ফেলে রাখতে পারে।

ইহুদী আইনে পরন্তৰীর সাথে যিনা সম্পর্কে যে বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

“আর মূল্য দ্বারা কিসি অন্যরূপে মুক্তা হয় নাই, এমন যে বাগদত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ সংগম করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে।” (লেবীয় পৃষ্ঠক ১৯ : ১৭)

“আর যে ব্যক্তি পরের ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।” (লেবীয় পৃষ্ঠক ২০ : ১০)

“কোন পুরুষ যদি পরত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে।” (থিতীয় বিবরণ ২২ : ২২)

“যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা, নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষকে বধ করিবে, কেননা, সে আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে মানবষ্টা করিয়াছে ; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দৃষ্টাচার লোপ করিবে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বনপূর্বক তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হইবে, কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না।” (থিতীয় বিবরণ ২২ : ২৩-২৬)

কিন্তু হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগের বহু পূর্বে ইহুদী উলামা, ফর্কীহ, শাসক ও জনতা সবাই এ আইন কার্যত রহিত করে দিয়েছিল। যদিও এ আইন বাইবেলে লিখিত ছিল এবং একেই আগ্নাহর হক্ক মনে করা হতো কিন্তু কেউ এর কার্যত প্রচলনের পক্ষপাতি ছিল না। এমনকি এ হক্কুটি কখনো জারি করা হয়েছিল এমন কোন নজিরণে ইহুদীদের ইতিহাসে পাওয়া যেতো না। হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন সত্যের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হন এবং ইহুদী আলেমগণ দেখেন এ বন্যা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হচ্ছে না তখন তারা একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তারা এক ব্যভিচারিনীকে তাঁর কাছে ধরে আনেন এবং বলেন, এর ফায়সালা করে দিন। (যোহন ৮:১-১১) এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হ্যরত ঈসাকে কুয়া বা খাদ দু'টোর মধ্য থেকে কোন একটিতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করা। যদি তিনি পাথর মেরে হত্যা (রজম) ছাড়া অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন, তাহলে একথা বলে তাঁর দুর্নাম রটানো হবে যে, দেখো ইনি একজন অভিনব পয়গম্বর এসেছেন, দুনিয়ার ভয়ে আগ্নাহর আইন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। আর যদি ‘রজম’ করার হক্ক দেন, তাহলে একদিকে রোমায় আইনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া হবে আর অন্যদিকে জাতিকে বলা হবে, এ পয়গম্বর সাহেবকে মেলে নাও, দেখে নাও একবার তাওরাতের পুরো শরীয়াত তোমাদের পিঠে ও জীবনের ওপর নিষ্কিঞ্চ হবে। কিন্তু হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালাম একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে তাদের কৌশল তাদের মাথার ওপর ছুঁড়ে মারেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে নিজে পাক-পবিত্র-ব্যভিচারমুক্ত সে এগিয়ে এসে এর ওপর পাথর নিষ্কেপ করো। এ কথা শুনতেই ফর্কীহদের পুরো জয়ায়েত ফাঁকা হয়ে যায়। প্রত্যেকে মুখ শুকিয়ে কেটে পড়েন এবং আগ্নাহর শরীয়াতের বাহকদের নৈতিক অবস্থা একেবারেই নষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তারপর যখন মেয়েটি একাকী দাঁড়িয়ে থাকে তখন তিনি তাকে নসীহত করেন

এবং তাওবা পড়িয়ে বিদায় করে দেন। কারণ তিনি বিচারক ছিলেন না। কাজেই তার মামলার ফায়সালা তিনি করতে পারতেন না। তাহাড়া তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীও উপস্থাপিত হয়নি। সর্বোপরি আগ্রাহের আইন জারি করার জন্য কোন ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

ইয়রত ঈসার এ ঘটনা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর আরো কৃতিপয় বিক্ষিণ্ণ বাণী থেকে ভুল খুঁতি সংগ্রহ করে ঈসামীরা যিনার অপরাধ সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা তৈরী করে নিয়েছে। তাদের মতে অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিত যেয়ের সাথে যিনি করে তাহলে এটা যিনা তো হবে ঠিকই কিন্তু শান্তিযোগ্য অপরাধ হবে না। আর যদি এ কর্মের পূরুষ বা নারী যে কোন এক পক্ষ বিবাহিত হয় অথবা উভয় পক্ষই হয় বিবাহিত, তাহলে এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু একে অপরাধে পরিণত করে “চুক্তি ভঙ্গ”, নিষ্কর্ষ যিনা নয়। তাদের মতে যে ব্যক্তিই বিবাহিত হবার পরও যিনা করে সে গীর্জায় পাদরীর সমন্বে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে যে বিশৃঙ্খলার অংশিকার ও চুক্তি করেছিল তা ভঙ্গ করে ফেলেছে তাই নে অপরাধী। কিন্তু এ অপরাধের এ ছাড়া আর কোন শাস্তি নেই যে, যিনাকারী পুরুষের স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে অবিশৃঙ্খলার দাবী করে বিবাহ বিছেদের ডিক্রি দাত করতে পারবে এবং যিনাকারী স্ত্রীর স্বামী একদিকে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিশৃঙ্খলার দাবী করে বিবাহ বিছেদের ডিক্রি দাত করতে পারবে এবং অন্যদিকে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খারাপ করেছে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড নাত করার অধিকার রাখে। খৃষ্টীয় আইন বিবাহিত ব্যক্তিচারী ও ব্যক্তিচারিনীকে এ শাস্তি দিয়ে থাকে। আর সর্বানাশের ব্যাপার হচ্ছে, এ শাস্তি দুধারি তলোয়ারের মতো। যদি কোন স্ত্রী তার বিশ্বাসযাতক স্বামীর বিরুদ্ধে “অবিশৃঙ্খলার” দাবী করে বিবাহ বিছেদের ডিক্রি হাসিল করে নেয়, তাহলে তো সে সেই বিশ্বাসযাতক স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু খৃষ্টীয় আইন অনুযায়ী এরপর আর সে জীবনভর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর যে পুরুষটি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিশৃঙ্খলার দাবী এনে বিবাহ বিছেদ করেছিল তার অবস্থাও তাই হবে। কারণ খৃষ্টীয় আইন তাকেও দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এ যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে যে সারা জীবন যৌন হিসেবে থাকতে চাইবে নিজের জীবন সংগী বা সৎসনীয় বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় আদালতে তার অবিশৃঙ্খলার মামলা ঠুকে দিলেই চলবে।

বর্তমান যুগের পার্শ্বাত্ম্য আইন-কানুন এসব বিচিত্র চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলি আজ এসব আইনের ধারা অনুসরণ করে চলছে। এ পার্শ্বাত্ম্য আইনের দৃষ্টিতে যিনি করা একটি দোষ, নৈতিক চরিত্রহীনতা বা পাপ যাই কিছু হোক না কেন, মোটকথা এটা কোন অপরাধ নয়। একে যদি কোন জিনিস অপরাধে পরিণত করতে পারে তাহলে তা হচ্ছে এমন ধরনের বল প্রয়োগ যার সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন ক্রিয়া করা হয়। আর কোন বিবাহিত পুরুষের যিনা করার ব্যাপারটি হচ্ছে, তা যদি অভিযোগের কারণ হয়ে থাকে তাহলে তা হয় তার স্ত্রীর জন্য। সে চাইলে তার প্রমাণ দিয়ে তালাক হাসিল করতে পারে। আর যিনার অপরাধী যদি হয় বিবাহিতা নারী, তাহলে তার স্বামীর ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে নয় বরং যিনাকারী পুরুষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেখা দেয় এবং উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সে স্ত্রী থেকে তালাক এবং যিনাকারী পুরুষ থেকে অর্থদণ্ড নিতে পারে।

তিনি : এসব চিন্তার বিপরীতে ইসলামী আইন স্বয়ং যিনাকেই একটি শান্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে এবং বিবাহিত হবার পরও যিনা করলে তার দৃষ্টিতে তা অপরাধের মাত্রা আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়। এটা এ জন্য নয় যে, অপরাধী কারোর সাথে “চুক্তিভঙ্গ” অথবা অন্য কারো বিছানায় হস্তক্ষেপ করেছে। বরং এ জন্য যে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। ইসলামী আইন যিনাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হচ্ছে এই যে, এটি এমন একটি কর্ম যাকে স্বাধীনভাবে করার সুযোগ দেয়া হলে একদিকে মানব বংশধারা এবং অন্যদিকে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলাঙ্কেদে হয়ে যাবে। বংশধারার স্থায়িত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ের জন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরিহার্য। আর তার সাথে যদি অবাধ যৌন সম্পর্কেরও খোলাখুলি অবকাশ থাকে তাহলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। কারণ গৃহ ও পরিবারের দায়িত্বের বোধা বহন করা ছাড়া যেখানে লোকদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার সুযোগ থাকে সেখানে তাদের থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, সেসব প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য তারা আবার এত বড় দায়িত্বের বোধা বহন করতে উদ্যত হবে। এটা ঠিক বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকার পর রেল গাড়িতে বসার জন্য টিকিটের শর্ত অর্থহীন হয়ে যাওয়ার মতো। টিকিটের শর্ত যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে কার্যকর করার জন্য বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তারপর যদি কোন ব্যক্তি পয়সা না থাকার কারণে বিনা টিকিটে সফর করে তাহলে সে অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের অপরাধী হবে এবং ধানাজ্য হবার পরও এ অপরাধ করলে তার অপরাধ আরো কঠিন হয়ে যায়।

চারি : ইসলাম মানব সমাজকে যিনার আশংকা থেকে বৌঢ়াবার জন্য শুধুমাত্র দণ্ডবিধি আইনের অন্তর ওপর নির্ভর করে না বরং তার জন্য ব্যাপক আকারে সংস্কার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আর এ দণ্ডবিধি আইনকে নির্ধারণ করেছে নিছক একটি শেষ উপায় হিসেবে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকেরা এ অপরাধ করে যেতেই থাকুক এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করার জন্য দিনরাত তাদের ওপর নজর রাখা হোক। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ অপরাধ না করে এবং কাউকে শান্তি দেবার সুযোগই না পাওয়া যায়। সে সবার আগে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে। তার মনের মধ্যে বসিয়ে দেয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহর তত্ত্ব। তার মধ্যে আবেরাতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মরেও মানুষ এ হাত থেকে বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এটি হচ্ছে ইমানের অপরিহার্য দাবী। আর তারপর বারবার তাকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, যিনা ও সতীত্বহীনতা এমন বড় বড় গোনাহর অত্যরভূত যেগুলো সম্পর্কে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সমগ্র কুরআনে বারবার এ বিষয়বস্তু সামনে আসতে থাকে। তারপর ইসলাম মানুষের জন্য বিয়ের যাবতীয় সংস্কার সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এক স্তীতে তৎ না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্তী রাখার সুযোগ করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল না হলে স্বামীর জন্য তালাক ও স্তীর “খুলা”র সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর অমিলের সময় পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে সরকারী আদালতে পর্যন্ত আপীল করার পথ খুলে দেয়, এর ফলে দু’জনের মধ্যে সময়োত্তা হয়ে যেতে পারে আর নয়তো স্বামী-স্ত্রী

পরম্পরের বক্তব্য মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতো অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে। এসব বিষয় সূরা বাকারাহ, সূরা নিসা ও সূরা তালাকে দেখা যেতে পারে। আর এ সূরা নূরেও দেখা যান্ত্র পুরুষ ও নারীকে বিয়ে না করে বসে থাকাকে অপচন্দ করা হয়েছে এবং এ ধরনের শোকদের বিয়ে করিয়ে দেবার এমনকি গোগাম ও বাঁদীদেরকেও অবিবাহিত করে না রাখা। জন্য পরিকার হকুম দেয়া হয়েছে।

তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মূল করে দেয় যেগুলো যিনার আগ্রহ ও তার উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে পারে। যিনার শাস্তি বর্ণনা করার এক বছর আগে সূরা আহ্যাবে মেয়েদেরকে গৃহ থেকে বের হতে হলে চাদর মুড়ি দিয়ে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হকুম দেয়া হয়েছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্য যে নবীর গৃহ ছিল আদর্শ গৃহ সেখানে বসবাসকারী মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, নিজেদের গৃহ মধ্যে মর্যাদা ও প্রশাস্তি সহকারে বসে থাকো, নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িও না এবং বাইরের পুরুষেরা তোমাদের থেকে কোন জিনিস নিলে যেন পরদার আড়াল থেকে নেয়। দেখতে দেখতে এ আদর্শ সমস্ত মু'মিন মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কাছে জাহেলী যুগের নির্লজ্জ মহিলারা নয় বরং নবীর (সা) স্ত্রী ও কন্যাগণই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের শাস্তি নির্ধারণ করার আগে নারী ও পুরুষের অবাধ মিথিত সামাজিকতা বক্ত করা হয়, নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বক্ত করা হয় এবং যে সমস্ত কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ যিনার সুযোগ-সুবিধা তৈরী করে দেয় সেগুলোর দরজা বক্ত করে দেয়া হয়। এসবের পরে যখন যিনার ফৌজদারী তথা অপরাধমূলক শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন দেখা যায় এর সাথে সাথে এ সূরা নূরেই অশ্বিনতার সম্প্রসারণেও বাধা দেয়া হচ্ছে। পতিতাবৃত্তিকে (Prostitution) আইনগতভাবে বক্ত করা হচ্ছে। নারী ও পুরুষদের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে ব্যক্তিত্বের অপবাদ দেয়া এবং তার আলোচনা করার জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হচ্ছে। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হচ্ছে, যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্যায় পৌছুতে না পারে। এ সংগে নারীদেরকে নিজেদের ঘরে যাহুরাম ও গায়ের যাহুরাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করার এবং গায়ের যাহুরামদের সামনে সেজেগুজে না আসার হকুম দেয়া হচ্ছে। এ থেকে যে সংস্কার পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে যিনার আইনগত শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার সমগ্র অবয়বটি অনুধাবন করা যেতে পারে। ভিতর-বাইরের যাবতীয় সৎস্থান ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্ট প্রকৃতির লোক প্রকাশ্য বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার উপর জোর দেয় তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার এবং একজন ব্যক্তিগৱাচীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের এ ধরনের প্রবৃত্তির অধিকারী বহু সংখ্যক শোকের মানসিক অপাত্রেশন করার জন্যই এ শাস্তি। এ শাস্তি নিছক একজন অপরাধীর শাস্তি নয় বরং এটি একটি কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যক্তিগৱাচীদের অবাধ বিচরণস্থল নয় এবং এটি স্বাদ আস্থাদনকারী পুরুষ ও নারীদের নৈতিক বৌধন মুক্ত হয়ে যথেষ্ট আমোদ ফূর্তি করার জায়গাও নয়। এ দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি ইসলামের এ সংস্কার পরিকল্পনা অনুধাবন করতে চাইলে সহজে অনুভব করেন যে, এ সমগ্র পরিকল্পনার একটি অংশকেও তার নিজের জায়গা থেকে সরানো যেতে পারে না এবং এর মধ্যে কোন কমবেশীও করা যেতে পারে।

না। এর মধ্যে রদবদল করার চিন্তা করতে পারে এমন একজন অজ্ঞ-নাদান, যে একে অনুধাবন করার যোগ্যতা ছাড়াই এর সৎশোধনকারী ও সংস্কারক হয়ে বসেছে অথবা মহাজ্ঞানী আল্লাহ যে উদ্দেশে এ পরিকল্পনাটি দিয়েছেন তা পরিবর্তন করাই যার আসল নিয়ত এমন একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীই এ চিন্তা করতে পারে।

পাঁচ : তৃতীয় হিজরীতেই তো যিনাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এটি একটি আইনগত অপরাধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও বিচার বিভাগ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না। বরং তখন এটি ছিল একটি "সামাজিক" বা "পরিবারিক" অপরাধ। পরিবারের লোকদেরই এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইতিয়ার ছিল। হকুম ছিল, যদি চার জন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ দেয় যে, তারা একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে যিনি করতে দেখেছে তাহলে তাদের দু'জনকে মারধর করতে হবে এবং মেয়েটিকে গৃহবন্দী করতে হবে। এ সংগে এ ইশারাও করে দেয়া হয়েছিল যে, "পরবর্তী হকুম" না দেয়া পর্যন্ত এ হকুমটি জারি থাকবে। আসল আইন পরে আসছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৫ ও ১৬ আয়াত এবং এ সংগে টাকাও) এর আড়াই তিন বছর পর সূরা নূরের এ আয়াত নামিল হয়। কাজেই এটি আগের হকুম রহিত করে যিনাকে একটি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যোগ্য (Cognizable Offence) আইনগত অপরাধ গণ্য করে।

ছয় : এ আয়াতে যিনার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তা আসলে "নিছক যিনা"র শাস্তি, বিবাহিতের যিনার শাস্তি নয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ বিবাহিতের যিনা কঠিনতর অপরাধ। একথা কুরআনের একটি ইশারা থেকে জানা যায় যে, সে এখানে এমন একটি যিনার শাস্তি বর্ণনা করছে যার উভয় পক্ষ অবিবাহিত। সূরা নিসায় ইতিপূর্বে বলা হয় :

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَانِكُمْ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যক্তিচারের অপরাধ করবে তাদের ওপর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চার জনের সাক্ষ নাও। আর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে এরপর তাদেরকে (অপরাধী নারীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দাও, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য বের করে দেন কোন পথ।"

(১৫ আয়াত)

এরপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বলা হয় :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يُنْكِحَ الْمُحْمَنِتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا أَحْصِنْ فَإِنَّ أَتْيَنَ
بِفِحَاشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنِتِ مِنَ الْعَذَابِ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিনদের মধ্য থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না, তারা তোমাদের মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে করবে। তারপর যদি (ঐ বাঁদীরা) বিবাহিত হয়ে যাবার পর ব্যক্তিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (এ ধরনের অপরাধে) স্বাধীন নারীদের ভুলনায় অর্ধেক দিতে হবে। (২৫ আয়াত)

এর মধ্যে প্রথম আয়াতে আশা দেয়া হয়েছে যে, ব্যতিচালিনদের ঘন্টা, খাদেরকে আপাতত বলী করার হকুম দেয়া হচ্ছে, আর এই পরে কোন পথ বের করে দেবেন। এ থেকে ধানা যায়, সূরা নিসার উপরে উপরেও আয়াতে যে ওয়াদা করা হয়েছিল এ ডিত্তের হকুমটির মাধ্যমে সে ওয়াদা পূরণ করা হচ্ছে। ডিত্তের আয়াতে বিবাহিতা বাঁধীর ফিলার শাস্তি বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে একই আয়াতে এবং একই বর্ণনা ধরায় দু'বার “মুহসানাত” তথা খাদীন নারী শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে আর উভয় চাপগাই এর অর্থ একই, একথা অবশ্য মানতেই হবে এবার শুরুর দিকের বাক্যাংশ দেখুন। সেখনে বলা হচ্ছে, যারা “মুহসানাতদের” বিজে করার ক্ষমতা রাখে না। অবশ্যই এখানে “মুহসানাত” মানে বিবাহিতা নারী হতে পারে না বরং এর মানে হতে পারে, একটি খাদীন পরিবারের অবিবাহিতা নারী। তারপর শেষের বাক্যাংশে বলা হচ্ছে, বাঁধী বিবাহিতা দ্বারা পর যদি যিনা করে, তাহলে এ অপরাধে মুহসানাতের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার শাস্তি হবে তার অর্থেক। পরবর্তী আলোচনা পরিকার জানিয়ে দিতেই যে, প্রথম বাক্যাংশে “মুহসানাত” অর্থ যা ছিল এ বাক্যাংশেও তার অর্থ সে একই অর্থে বিবাহিতা নারী নয় বরং খাদীন পরিবারে শাশীতা পাচিতা অবিবাহিতা নারী। এভাবে সূরা নিসার এ দু'টি আয়াত একত্র হয়ে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সেখানে অবিবাহিতাদের দিনার শাস্তির ক্ষেত্রে বর্ণনার যে ওয়াদা করা হয়েছিল সূরা নূরের এ হকুমটি সে কথাই বর্ণনা করছে (আরো বের্ষী ব্যাখ্যার ঘন্টা দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৬ টাক্কা)।

সাত : বিবাহিতের ফিলার শাস্তি কি, একটি কুরআন মর্দীদ থেকে নয় এবং দাসীস থেকে আমরা জানতে পারি: অসংক্ষি নির্ভরযোগ্য হাস্তিস থেকে প্রমাণিত, নবী সাফত্তাহ আনাইহি ওয়া সাফ্তাম কেবল মুখেই এর শাস্তি রাজ্য (প্রত্যোধাতে মৃত্যু) বর্ণনা করেননি বরং কার্যত বহু সংখ্যক মোকদ্দমায় তিনি এ শাস্তি ধারিত করেন। তাঁর পরে চার খোঁকায়ে রাশেদীনও নিজ নিজ ধূগে এ শাস্তি ধারি করেন এবং আইনগত শাস্তি হিসেবে বারবার এরি ঘোষণা দেন। সাহাবায়ে ফেরাম ও তাবেক্ষণ ছিলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কোন এক ব্যক্তিরও এমন একটি উক্তি পাওয়া যায় না যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারে যে, প্রথম ধূগে এর প্রমাণিত শরয়ী হকুম ইবার বাপারে কোন সদেহ ছিল। তাঁদের পরে সকল ধূগের ও দেশের ইসলামী ফর্মুলগণ এর একটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নত হবার বাপারে একমত ছিলেন। কারণ এর নির্ভুতর সপ্তকে এত দিপুর সংখ্যক ও শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যার উপরিতে কোন ভৃত্যানী একই অর্ধেকার করতে পারেন না। উচ্চতে মুসলিমার সময় ইতিহাসে খারেজী ও কোন কোন মুতাবিক ছাড়া কেউই একথা অর্ধেকার করেননি খারেজী ও মুতাবিকাদের অবৈক্যত্বের কারণ এটা নয় যে, তাঁরা নবী সাফত্তাহ আনাইহি ওয়া সাফ্তাম থেকে এর প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। বরং তাঁরা একে কুরআন বিরোধী ধূগ করতেন। অথচ এটি ছিল তাঁদের নিতেদের কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁরা বাস্তুতেন, কুরআন *الرَّازِنِيُّ وَالرَّازِنِيَّةِ* এর একচেত্রে শর্তহীন শব্দ ব্যবহার করে এর শাস্তি বর্ণনা করে একশ' বেত্রাধাত। কাজেই কুরআনের দৃষ্টিতে সকল প্রকার ব্যতিচারীকে পৃথক করে তাঁর জন্য কোন তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর ফিলুই নয়, কিন্তু তাঁরা এ কথা চিন্তা করেননি যে, কুরআনের শব্দাবচীর যে আইনগত উর্বরত রয়েছে সে একই

ଗୁରୁତ୍ବର ଅଧିକାରୀ ହଛେ ତାଦେର ଉଦ୍‌ଭୂତ ନବୀ ସାନ୍ନାତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାନ୍ନାମେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ । ତବେ ଏଥାନେ ଶର୍ତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହଛେ ଏହି ଯେ, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେ ତୌରଇ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହତେ ହବେ ।

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

ତଥା ପୁରୁଷ ଚୋର ଓ ମେଯେ ଚୋରେର ଶାନ୍ତି ହିସେବେ ହାତ କାଟାର ବିଧାନ ଦିଯେଛେ । ଏ ବିଧାନକେଓ ଯଦି ନବୀ ସାନ୍ନାତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାନ୍ନାମେର ପ୍ରମାଣିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାସମୂହରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନା କରା ହୁଯ ତାହଲେ ଏର ଶଦ୍ଵାବଳୀର ବ୍ୟାପକତାର ଦାବୀ ହଛେ ଏହି ଯେ, କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଏକଟି ସୁଇ ବା କୁଳ ଚୂରି କରଲେଓ ତାକେ ଚୋର ଆଖ୍ୟା ଦିଯେ ତାର ହାତଟି ଏକେବାରେ କୌଧର କାଛ ଥେକେ କେଟେ ଦେଖା ହବେ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଲାଖ ଲାଖ ଟାକା ଚୂରି କରାର ପରିପ୍ରେ ଯଦି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାକଡ଼ାଓ ହୁୟେ ବଲେ, ଆମି ନିଜେକେ ସଂଶୋଧନ କରେ ନିଯେଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ଆମି ଆର ଚୂରି କରବୋ ନା, ଚୂରି ଥେକେ ଆମି ତାଓବା କରେ ନିଲାମ ତାହଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ତାକେ ଅବଶ୍ୟ ଛେଢ଼େ ଦିତେ ହବେ । କାରଣ କୁରାଆନ ବଲାହେ :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمٍ هُوَ أَصْلَحٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

“ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଲ୍ମ କରାର ପରେ ତାଓବା କରେ ଏବଂ ନିଜେକେ ସଂଶୋଧନ କରେ ନେଇ, ଆଗ୍ରାହ ତାର ତାଓବା କବୁଲ କରେ ନେଇ ।” (ମା-ଯେଦାହ, ୩୯)

ଏତାବେ କୁରାଆନ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଦୁଧ-ମା ଓ ଦୁଧ ବୋନକେ ବିଯେ କରା ହାରାମ ଘୋଷଣା କରେଛେ, ଦୁଧ-କନ୍ୟାକେ ବିଯେ ଏ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ କୁରାଆନ ବିରୋଧୀ ହେଉୟା ଉଚିତ । କୁରାଆନ କେବଳମାତ୍ର ଦୁଇ ବୋନକେ ଏକ ସଂଗେ ବିଯେ କରା ନିଷେଧ କରେଛେ । ଖାଲା-ଭାଗନୀ ଏବଂ ଫୁଫୀ-ତାଇବିକେ ଏକତ୍ରେ ବିଯେ କରାକେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରାମ ବଲେ ତାର ବିରଳଙ୍କୁ କୁରାଆନ ବିରୋଧୀ ହକୁମ ଦିଲ୍ଲେ ବଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆନତେ ହବେ । କୁରାଆନ ସ୍ବ-ମେଯେକେ ବିଯେ କରା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତଥନଇ ହାରାମ କରେ ଯଥନ ମେ ତାର ସ୍ବ-ପିତାର ଘରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁୟ । ଶତହିନ ଓ ଏକ୍ଷତଭାବେ ଏର ହାରାମ ହେଉଥାର ବିଷୟଟି କୁରାଆନ ବିରୋଧୀ ଗଣ୍ୟ ହେଉୟା ଉଚିତ । କୁରାଆନ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଏମନ ଅବହୃତ ‘ରେହେନ’ ରାଖାର ଅନୁମତି ଦେଇ ଯଥନ ମାନୁଷ ବିଦେଶେ ସଫରରତ ଥାକେ ଏବଂ ଝଣ ସଂକ୍ରନ୍ତ ଦଲିଲପତ୍ର ଲେଖାର ଲୋକ ପାଓୟା ଗେଲେ ଏ ଅବହୃତ ରେହେନ ରାଖାର ବୈଧତା କୁରାଆନ ବିରୋଧୀ ହେଉୟା ଉଚିତ । କୁରାଆନ ସାଧାରଣ ଓ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶଦେର ମାଧ୍ୟମେ ହକୁମ ଦେଇ : **وَأَشْهِبُوا إِذَا تَبَاعِثُمْ**

(ଆର୍ଥାଂ ପରମ୍ପରରେ ମଧ୍ୟେ କେନାବେଚା କରାର ସମୟ ସାଞ୍ଚି ରାଖୋ)

ଏ ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଆମାଦେର ହାଟେ-ବାଜାରେ-ଦୋକାନେ ଦିନରାତ ବିନା ସାଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣେ ଯେସବ କେନାବେଚା ହଛେ ମେସବଇ ଅବୈଧ ହେଉୟା ଉଚିତ । ଏଥାନେ ଶୁଟିକ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିତ୍ୱ ପେଶ କରିଲାମ । ଏଗୁଲୋର ଓପର ଚୋଖ ବୁଲାଲେ ରଜମ ତଥା ପ୍ରତ୍ଯାମାଧାତେ ମୁତ୍ତୁଦୁଗୁକେ ଯାରା କୁରାଆନ ବିରୋଧୀ ବଲେନ, ତାଦେର ଯୁକ୍ତିର ଗଲଦ ଚୋଥେ ସାମନେ ଭେସେ ଉଠିବେ । ଶରୀଯାତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହଛେ, ତିନି ଆମାଦେର କାହେ ଆଗ୍ରାହର ହକୁମ ପୌଛିଯେ ଦେବାର ପର ଆମାଦେର ଜାନାବେନ ତାର ଅର୍ଥ କି, ତା କାର୍ଯ୍ୟକର କରାର ପରତି କି, କୋନ୍ କୋନ୍ ବିଷୟେ ତା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହବେ ଏବଂ କୋନ୍ କୋନ୍ ବିଷୟେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହବେ ନା । ଇସଲାମୀ ଶରୀଯାତ୍ତି ନବୀର ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନସ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ । ନବୀର ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପଦାଧିକାର ଅସ୍ତିକାର କରା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଦୀନେର ମୂଳନୀତିରିଇ ଅସ୍ତିକାର ନଯ ବରଂ ଏର ଫଳେ ଅଗ୍ରଣିତ ବାନ୍ଧବ କ୍ରମିତ ଦେଖା ଦେଇ ।

ଆଟ : ଯିନାର ଆଇନଗତ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରେ ଫକୀହଗଣେ ମଧ୍ୟେ ମତବିରୋଧ ରଯେଛେ । ହାନାଫୀଗଣ ଏର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ବଲେନ, କୋନ ପୁରୁଷେର ଏମନ କୋନ ନାରୀର ସାଥେ ସମ୍ମାନ

১০

খার দিয়ে সংগম করা যে তার বিয়ে করা হী বা মাদিকানাধীন বাঁদী নয় এবং ধাকে বিবাহিতা হী বা মানিকানাধীন বাঁদী মনে করে সংগম করেছে বলে সন্দেহ পোবণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণও দেখানে নেই।” এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে পচাশাধুরে সংগম, দৃতের সম্প্রদায়ের কর্ম, পচতর সাথে সংগম ইত্যাদির উপর দিনার অর্থ প্রযোজ্য হয় না। শুধুমাত্র অথবা শরীয়াতে সুস্পষ্ট অথবা অশ্পষ্ট অধিকার ছাড়া নারীর সাথে সম্মুখীন দিয়ে সংগম করা হয় তখনই তা দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিগ্রামী গকে শাকেন্দগণ এর সংজ্ঞা এতাবে বর্ণনা করেন, “শরীয়াতকে এমন ধরণস্থানে প্রবেশ করানো যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে যেদিকে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।” আর মানেকৌদের মতে এর সংজ্ঞা হচ্ছে, “শরীয়াত নির্ধারিত সুস্পষ্ট অথবা অশ্পষ্ট অধিকার ছাড়া সম্মুখীন বা পচাশাধুর দিয়ে পুরুষ বা নারীর সাথে সংগম করা” এ দুটি সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে দৃতের আতিরিক কর্মও দিনার অস্তরভূত হয়ে যায়। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এ দুটি সংজ্ঞাই দিন শব্দের পরিচিত ব্যাখ্যার বাইরে পড়ে। কুরআন সবসময় শব্দকে তার পরিচিত ও সাধারণের দল্লা শহুরবোধ অর্থে ব্যবহার করে ধাকে। তবে কৰ্মনো আবার সে কোন শব্দকে তার বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে এবং এ অবস্থায় সে নিজেই তার বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে দিন শব্দটিকে কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করার কোন দর্শণ নেই। কাজেই একে পরিচিত অর্থেই গ্রহণ করা হবে। আর এ অর্থটি নারীর সাথে প্রাতিক কিন্তু অবৈধ সম্পর্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যৌন কামনা চরিতার্থ করার অন্যান্য উপায় ও অবস্থা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত নয়। এ ছাড়া একথাও সবার জানা যে, দৃতের আতিরিক কুরুক্ষ তথা সমকামের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে ক্রেতামের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। এ কর্মটিকেও ফলি ইস-লামী পরিভাষার দৃষ্টিতে দিনার মধ্যে শামিন করা হতো তাহলে একবা সুস্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে মতবিরোধের কোন অবকাশই থাকতো না।

নয় : আইনগতভাবে একটি দিন কর্মকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করার দল্লা কেবলমাত্র পুরুষাঙ্গের অঞ্চলে প্রবেশ করানোটাই যথেষ্ট, সম্পূর্ণ প্রবেশ বা ক্রিয়া সম্পর্ক হওয়া এ দল্লা ধরণকৰ্ত্তা নয়। পক্ষত্বে যদি পুরুষাঙ্গ প্রবেশ না করে, তাহলে নিকুঁত এক বিশেষাঙ্গ দু'জনকে পাওয়া অথবা ধড়াড়ি করতে দেখা কিংবা উৎপণ অবস্থায় পাওয়া কাউকে দিনাকারী গণ্য করার দল্লা যথেষ্ট নয়। আবার কোন দু'জন নারী পুরুষকে এ অবস্থায় পেশে তাদের ডাঙড়ারী পর্যাকৃতি করার মাধ্যমে দিনার প্রমাণ পেশ করে তাদের বিলুপ্তে দিনার শাস্তি প্রয়োগ করার কথাও ইস-লামী শরীয়াত বলে না। যাদেরকে এ ধরনের অঙ্গুলি কাজে নিষ্ঠ পাওয়া যাবে তাদেরকে নিষ্কর এমন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার ফলসমূহ ক্রয়বেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের বিচারপতি নিজেই অথবা ইস-লামী রাষ্ট্রের মানিসে শূরা তাদের দেন। কোন শাস্তি নির্ধারণ ক্রয়বেন, এ শাস্তি বেত্রাঘাতের আক্রমে হবে তা দশ ধা’র বেশী হবে না। কারণ হাদীসে পরিকার বলা হয়েছে :

لَا يَجِدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍ مِنْ حَدُودِ اللَّهِ

“আঞ্চলিক নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া অন্য যে কোন অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের বেশী শাস্তি দিয়ো না।” (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

আর যদি কোন ব্যক্তি পাকড়াও হয়নি বরং নিজেই ধজ্জিত হয়ে এ ধরনের কোন অপরাধের কথা শীকার করে, তাহলে তার জন্য শুধুমাত্র তাওয়া করার নির্দেশ দেয়াই

যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হায়ির হয়ে বললেন : “নগরের বাইরে আমি একটি নারীর সাথে সংগম ছাড়া সবকিছু করে ফেলেছি। এখন জ্ঞাব আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শান্তি দিন।” হ্যরত উমর (রা) বললেন : “আল্লাহ যখন গোপন করে দিয়েছিলেন তখন তুমিও গোপন থাকতে দিতে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লাম সবকিছু শোনার পর নীরব থাকলেন এবং সে ব্যক্তি চলে গেলেন। তারপর তিনি তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন :

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَذَلِكَ مِنَ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الْسَّيِّئَاتِ

“নামায কার্যেম করো দিনের দুই প্রাতে এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হবার পর। অবশ্যই সৎকাজ অসৎকাজগুলোকে দূর করে দেয়।” (হৃদ, ১১৪)

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কি শুধু তারই জন্য” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লাম বললেন, “না, সবার জন্য।” (মুসলিম, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী) শুধু এতটুকুই নয়, কোন ব্যক্তি অপরাধের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে যদি নিজের অপরাধী হবার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে এ অবস্থায় অনুসন্ধান চালিয়ে সে কি অপরাধ করেছে তা জানতে চাওয়াটাও শরীয়ত বৈধ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামের খিদমতে এক ব্যক্তি হায়ির হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডাতের অধিকারী হয়ে গেছি, আমাকে শান্তি দিন।” কিন্তু তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তুমি কোনু দণ্ডাতের অধিকারী হয়েছো? তারপর নামায শেষ হবার পর এ ব্যক্তি আবার উঠে বললেন, “আমি অপরাধী, আমাকে শান্তি দিন।” রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তুমি কি এখনি আমাদের সাথে নামায পড়নি?” জবাব দিলেন, “জি হৈ।” বললেন, “ব্যস, তাহলে আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ)

দশ : কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কেবলমাত্র সে যিনি করেছে এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য অপরাধীর মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। নিচের যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো এক ধরনের এবং বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে এগুলো আবার তিনি ধরনের।

নিচের যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো হচ্ছে, অপরাধী হবে জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাণ বয়ঙ্ক। যদি কোন বৃক্ষিক্রষ্ট পাগল বা শিশু এ কর্ম করে তাহলে তার ওপর যিনার শান্তি প্রযুক্ত হবে না।

বিবাহিতের যিনার জন্য প্রাণ বয়ঙ্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরো কয়েকটি শর্তও রয়েছে। নিচে আমি এগুলো বর্ণনা করছি :

প্রথম শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ কুরআন নিজেই ইংগিত করছে, গোলামকে রজমের শান্তি দেয়া যাবে না। একটু আশেই একথা আলোচনা হয়েছে যে, বাঁদী যদি বিয়ের পর যিনায় লিঙ্গ হয় তাহলে তাকে অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শান্তি দেয়া উচিত। ফকীহগণ স্বীকার করেছেন কুরআনের এ বিধানটিই গোলামের ওপরও প্রযুক্ত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে যথানুরোধ বিবাহিত হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারেও সবাই একমত। আর এ শর্তটির প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি নিজের বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক

করেছে অথবা যার বিয়ে হয়েছে কোন গাহিত পদ্ধতিতে, তাকে বিবাহিত গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ সে যদি যিনা করে তাহলে তাকে রজম নয় বরং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে।

তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে, তার নিছক বিয়েই যথেষ্ট নয় বরং বিয়ের পর সঠিক অর্থে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত মিলনও হতে হবে। নিছক বিবাহ অনুষ্ঠান কোন পুরুষকে বিবাহিত এবং কোন নারীকে বিবাহিতা করে না যার ফলে যিনা করার কারণে তাদেরকে রজম করা যেতে পারে। এ শর্তটির ব্যাপকেও অধিকাংশ ফর্কীহ একমত। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মধ্যে আরো এতটুকু সংযোজন করেন যে, একজন পুরুষ ও নারীকে কেবলমাত্র তখনই বিবাহিত গণ্য করা হবে যখন বিয়ে ও নিভৃত মিলনের সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন, প্রাণ বয়ক ও জ্ঞানসম্পর্ক হবে। এ অতিরিক্ত শর্তের ফলে যেটুকু পার্থক্য দেখা দেয় তা হচ্ছে এই যে, যদি একটি পুরুষের বিয়ে একটি বৌদ্ধী, উন্নাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক যেয়ের সাথে হয় তাহলে এ অবস্থায় সে নিজের স্ত্রীর সাথে নিভৃত মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এরপর যদি সে যিনায় লিঙ্গ হয় তাহলে রজমের শাস্তিলাভের অধিকারী হবে না। নারীর ব্যাপকেও এই একই কথা। সে তার গোলাম, উন্নাদ বা অপ্রাপ্ত বয়ক স্বামীর সাথে যৌন মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এর পরে যদি সে যিনায় লিঙ্গ হয় তাহলে রজমের শাস্তি দাতের অধিকারী হবে না। তবে দেখলে বুঝা যাবে, এই দু'জন বিচক্ষণ প্রতিভাবান ইমামের এই বধিত শর্তটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে, অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। এ ব্যাপকের ফর্কীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেই, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমাদ এ শর্তটি মানেন না। তাঁদের মতে অমুসলিমও যদি বিয়ে করার পর যিনায় লিঙ্গ হয় তাহলে তাকে রজম করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মাধেক এ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র মুসলমানকেই বিয়ে করার পর যিনায় লিঙ্গ হলে রজমের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এর যেসব যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সংগত ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, এক ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর মতো ডয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এই যে, সে পূর্ণ “বিবাহিত” অবস্থায় থাকা সম্মেলনে যিনা থেকে বিরত হয় না। বিবাহিত মানে হচ্ছে “নৈতিক দৃঢ় পরিবেষ্টিত।” আর তিনটি প্রাচীর এ পরিবেষ্টিনকে পূর্ণতা দান করে। প্রথম প্রাচীর হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। আখেরাতের জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহর শরীয়াতকে স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয় প্রাচীর হচ্ছে, তাকে সমাজের স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। সে কারোর গোলাম হবে না। কারণ মালিকের বিধিনিষেধ মেনে নিজের কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে তাকে বৈধ উপায় অবলম্বনে বাধা পেতে হয় এবং এর ফলে অশ্রমতা তাকে গোনাহে সিঁড় করতে পারে। কোন পরিবারও তার চরিত্র ও মান-সম্মান রক্ষায় সাহায্যকারী হয় না। আর তৃতীয় প্রাচীর হচ্ছে তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং নিজের কামনা পূর্ণ করার বৈধ উপায় তার করায়ত্ব আছে। এ তিনটি প্রাচীরের অস্তিত্ব যখন বিদ্যমান থাকে তখনই “দূর্গ পরিবেষ্টিন” পূর্ণতা লাভ করে এবং তখনই যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের তিন তিনটি প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে সে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণের যোগ্য গণ্য হতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম ও সবচেয়ে বড় প্রাচীর অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাসই উপস্থিত নেই সেখানে নিশ্চিতভাবেই দূর্গ পরিবেষ্টিন পূর্ণতা লাভ করেনি এবং এ কারণে

চরিত্রহীনতার অপরাধ এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌছে যায়নি যা তাকে চরম শাস্তির অধিকারী করে। ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহ তাঁর মুসনাদে এবং দারকৃত্বনী তাঁর সুনান গ্রন্থে ইবনে উমরের (রা) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ যুক্তিকে সমর্থন করে।

من اشرك بالله فليس بمحسن "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিক্ষক করেছে সে 'মুহসিন' নয়।"

যদিও এ হাদীসে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, না নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে মত বিরোধ আছে কিন্তু এ দুর্বলতা সত্ত্বেও মূল অর্থের দিক দিয়ে এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। এর জবাবে যদি ইহুদীদের একটি মোকদ্দমা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করার বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, তাহলে আমি বলবো, এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কিত সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস একত্র করলে পরিকার জানা যায় যে, সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ইসলামের প্রচলিত আইন (Law of the Land) নয়, তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন (Personal law) প্রয়োগ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীস উদ্বৃত্ত করেছেন যে, যখন এ মোকদ্দমা রস্তের কাছে আনা হলো তখন তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন : ماتجدون في التوراة في شأن الرجم يا ماتجدون في كتابكم

অর্থাৎ "তোমাদের নিজেদের কিতাব তাওরাতে এর কি বিধান প্রদত্ত হয়েছে?" তারপর যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের সমাজে রজমের বিধান আছে তখন তিনি বললেন : فاني الحكم بما في التوراة آمي সেই ফায়সালা দিছি যা তাওরাতে আছে।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ মোকদ্দমার ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেন : اللهم اني اول من احيا امرك اذا ماتوه "হে আল্লাহ! আমি প্রথম ব্যক্তি যে তোমার হকুমকে জীবিত করেছে যখন তারা তাকে মেরে ফেলেছিল।"

(মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)

এগার : 'যিনাকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় কাজটি করাও জরুরী। জ্ঞান জবরদস্তি যদি কাউকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধীও নয় এবং শাস্তিরও যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কেবল শরীয়াতের এ সাধারণ নিয়মই প্রযোজ্য হয় না যে, "বলপূর্বক কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো হলে তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত থাকে" বরং এ সূরায়ই সামনের দিকে গিয়ে কুরআন এমন মেয়েদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করছে যাদেরকে যিনা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ছাড়েও বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বলপূর্বক যিনা করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে বল প্রয়োগ করে যিনা করেছে তাকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যার ওপর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিরমিয়ী ও আবু দাউদের বর্ণনা হচ্ছে, জনৈক মহিলা অঙ্ককারের মধ্যে নামাযের জন্য বের হন। পথে এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে বলপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। তার চিত্কারে লোকেরা দৌড়ে এসে যিনাকারীকে ধরে ফেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম করান এবং মহিলাটিকে মুক্তি দেন। বুখারীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হ্যরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এক ব্যক্তি একটি মেয়ের সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। তিনি লোকটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে ছেড়ে দেন। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে নারীদের ব্যাপারে আইনের

কেত্তে ঐক্যত্ব রয়েছে কিন্তু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে পুরুষের কেত্তে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেই ও ইমাম হাসান ইবনে সানেহ বলেন, পুরুষকেও যদি যিনি করতে বাধ্য করা হল তাহলে তাকে মাফ করে দেখা হবে। ইমাম যুক্তর বলেন, তাকে মাফ করা হবে না। কারণ সে অঙ্গ সঞ্চালন না করলে এ কমটি সংঘটিত ইঙ্গাই সত্ত্ব নয় এবং তার অঙ্গ সঞ্চালনই একধর্ম প্রমাণ করে যে, তার নিচের যৌন কামনা এ কর্মের উদ্দোজ্ঞা হয়েছিল। ইমাম আবু হনীফা বলেন, যদি সরকার বা তার কোন প্রশাসক কোন ব্যক্তিকে যিনি করতে বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ এখন সরকারই অপরাধ করতে বাধ্য করছে তখন তার শাস্তি দেবার অধিকার থাকে না। কিন্তু যদি সরকার ছাড়া অন্য কেউ বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ নিচের যৌন কামনা ছাড়া অবশ্যই সে যিনি করতে পারে না এবং যৌন কামনা হোরপূর্বক সৃষ্টি করা হতে পারে না। এ তিনটি বজ্জ্বের মধ্যে প্রথম বক্তব্যটিই সবচেয়ে বেশী সঠিক এর মুক্তি হচ্ছে, অঙ্গ সঞ্চালন যৌন কামনার প্রমাণ হতে পারে কিন্তু সম্মতি ও মানসিক আকর্ষণের অপরিহার্য প্রমাণ নয়। মনে করুন, কোন ধোদেম এক শরীর ব্যক্তিকে যোর পূর্বক ফ্রেক্ষন করে বন্দী করে এবং তার সাথে একটি সুন্দরী মেয়েকেও উৎপন্ন করে একই কামনায় আটকে রাবে। এ মেয়ের সাথে যিনায় নিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে মুক্তি দেয় না। এ অবস্থায় যদি তারা দুর্নীতি দিয়ে থায় এবং এই দুর্নীতি ঘটনার চার ধূন সার্বিসহ তাদেরকে আদানতে হার্যির করে, তাহলে তাদের বাস্তব অবস্থা উৎপন্ন করে তাদেরকে প্রশঁসনাতে মৃত্যুদণ্ড দান অথবা বেগোধাত করার শাস্তি কি ন্যায়সংগত হবে? এখন অবস্থা সৃষ্টি ইঙ্গায় মুক্তি ও বাস্তবতা-উভয়ের নিরিবেই সত্ত্ব থাতে যৌন কামনার উদ্দ্রেক ঘটতে পারে কিন্তু মানুষের নিচের ইঘা ও অগ্রহ তার সহযোগী হয় না। যদি কোন ব্যক্তিকে বলী করে কারাগারে আবস্থ রেখে তাকে পান করার জন্য শরাব ছাড়া আর কিন্তুই দেয় না হয় এবং এ অবস্থায় সে শরাব পান করে, তাহলে নিষ্ক এ মুক্তিতে কি তাকে শাস্তি দেয়া হতে পারে যে, তার জন্য তো অবশ্যই বাধ্যবাধকভাব অবস্থা হিন টিকেই কিন্তু নিচের ইঘা ছাড়া তো দানার মধ্য দিয়ে শরাবের তরল পদার্থ সে নীচের দিকে নামাতে পারতো না। অপরাধ ঘটার জন্য কেবলমাত্র ইঘা থাকা যথেষ্ট নয় এবং এ অন্য অধীনে ইঘার প্রযোগে। যে ব্যক্তিকে ধরবাদন্তি এমন এক অবস্থা মুহোমুহি করানো হয় যার ফলে সে অপরাধ করার সংকলন করতে বাধ্য হয়, সে কোন কোন অবস্থায় তো একেবারেই অপরাধী হয় না এবং কোন কোন অবস্থায় তার অপরাধ খতি সামান্যই হয়ে থাকে।

বারো : ইসলামী আইন সরকার ছাড়া আর কাউকেই যিনাকারী ও যিনাকারীর বিরুদ্ধে পদবেপে গ্রহণ করতে ক্ষমতা দেয় না, সে আদানত ছাড়া আর কাউকেই তাদেরকে শাস্তি দেবার অধিকার দেয় না, আরো আর্যাতে “তাদেরকে বেগোধাত করো” শব্দবর্তীর মাধ্যমে ধন্যবাদকে নয়। এবং রাস্তায় শাসকবৃন্দ ও বিচারপতিগণকে সঙ্গেধন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে উচ্চতের সকল ফর্ম একমত। তবে গোণামদের কেত্তে মতবিরোধ রয়েছে। তার প্রভু এ ব্যাপারে তাকে শাস্তি দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নে সবাই একমত নয়। হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রভু গোণামকে শাস্তি দিতে পারে না। শাফেই ইমামগণ বলেন, তাদের সে ক্ষমতা আছে, আর মাদেকীগণ বলেন, চুরির অপরাধে

প্রভু গোলামের হাত কাটার অধিকার রাখে না কিন্তু যিনা, সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে মধ্যে অপবাদ ও শরাব পানের শাস্তি দিতে পারে।

তেরোঃ ইসলামী আইন যিনার শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ গণ্য করে। তাই মুসলিম অমুসলিম নিবিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উপর এ আইন জারি হবে। এ ব্যাপারে একমাত্র ইমাম মালেক ছাড়া সভ্যবত ইমামদের মধ্য থেকে মার কেউ হিত প্রকাশ করেননি। রজমের শাস্তি অমুসলিমদের উপর প্রয়োগ করার পথে ইমাম আবু হানীফার যে মতবিশেষ তার ভিত্তি এ নয় যে, এটি রাষ্ট্রীয় আইন নয়। বরং এ মত বিবেচের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তৌর মতে রজমের শর্তাবলীর মধ্যে যিনাকারীর “পূর্ণ বিবাহিত” হওয়া হচ্ছে অন্যতম শর্ত। আর পূর্ণ বিবাহিত হওয়া ইসলাম ছাড়া সভ্য নয়। তাই তিনি অমুসলিম যিনাকারীকে রজমের শাস্তির আওতা বহিস্তৃত গণ্য করেন, বিপরীত পক্ষে ইমাম মালেকের মতে এ হকুমটি মুসলমানদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, কাফেরদের জন্য নয়। তাই তিনি যিনার দণ্ডবিধিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের (Personal Law) একটি অংশ গণ্য করেন। আর অন্য দেশ থেকে দারুল ইসলামে অনুমতি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেঈ বলেন, সে যদি দারুল ইসলামে যিনায় নিষ্ঠ হয়, তাহলে তার উপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা তার উপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করতে পারি না।

চৌদঃ : কোন ব্যক্তি নিজের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করবে অথবা কারোর যিনার কথা যারা জানতে পারে তারা ব্যতুক্ত হয়ে শাসকের কাছে অবশ্যই তা পৌছাবে, ইসলামী আইন এটা অপরিহার্য গণ্য করে না। তবে শাসকরা যখন এ অপরাধের কথা জানতে পারেন তখন আর সেখানে ক্ষমার কোন অবকাশ থাকে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَتَى شَيْئًا مِّنْ مُّذِّنِ الْقَانُورَاتِ فَلَيُبَشِّرْ تُبْسِرْ اللَّهُ فَإِنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقْبَلَنَا عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ (احكام القرآن - للجصاص)

“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এসব নোঝা অপরাধগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিতে নিষ্ঠ হয়ে যায়, সে হেন আল্লাহর পরদার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে পরদা উঠায়, তাহলে আমরা তার উপর আল্লাহর কিতাবের আইন প্রয়োগ করেই ছাড়বো।” (আহকামুল কুরআন-জাসুস)

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মাঝে ইবনে মালেক আস্লামী অপরাধে জড়িত হয়ে পড়লে হায়থাল ইবনে নু’আইম তাকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করো। তাই তিনি গিয়ে রসূলল্লাহর (সা) কাছে নিজের অপরাধ বর্ণনা করেন। এর ফলে তিনি একদিকে তাকে রজমের শাস্তি দেন এবং অন্য দিকে হায়থালকে বলেন, **لَوْسَرْتَهُ بِثُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ** “যদি তুমি তার উপর পরদা ফেলে দিতে, তাহলে তোমার জন্য বেশী তালো হতো।” আবু দাউদ ও নাসায়াতে অন্য একটি হাদীস উল্লিখ হয়েছে। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

تَعَافُوا الْحُسْنَى فِي مَا بَلَغْنَكُمْ فَمَا بَلَغْنَى مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ

“শাস্তিযোগ্য অপরাধকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যে অপরাধের ব্যাপারটি আমার কাছে পৌছে যাবে তার শাস্তি বিধান করা ভয়ঙ্গিব হয়ে যাবে।”

পনের : ইসলামী আইনে এ অপরাধটি পারম্পরিক আপোসের মাধ্যমে ফায়সালা করে নেবার ব্যাপারও নয়। হাদীসের প্রায় সবক'টি কিতাবে এ ঘটনাটি উচ্চৃত হয়েছে যে, একটি ছেলে এক বৃক্ষের কাছে পারিষমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে তার জীব সাথে যিনা করে বসে। ছেলেটির বাপ একশ ছাগল ও একটি বীদি দিয়ে ঐ বৃক্ষকে রাখি করিয়ে নেয়। কিন্তু এ মামলাটি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে তখন তিনি বলেন “أَمَا غَنْمُكَ وَجَارِيْتَكَ فَرِدٌ عَلَيْكَ” তোমার ছাগল ও তোমার বীদি ভূমিই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।” তারপর তিনি যিনাকারী ও যিনাকারিনী উভয়ের উপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করেন। এ থেকে কেবল এতটুকুই জানা যায় না যে, এ অপরাধে আপোসে রাখি করিয়ে নেবার কোন অবকাশ নেই। বরং একথাও জানা যায় যে, ইসলামী আইনে অর্ধদণ্ডের আকারে সতীত্বের বিনিময় দান করা যেতে পারে না। ইজ্জতের মৃত্যু প্রদান করার এ ধরনের জঘন্য তাবধারা পাচ্চাত্য আইনেরই বৈশিষ্ট।

ষেষ : কোন ব্যক্তির যিনা করার কোন প্রমাণ না পাওয়া পেলে ইসলামী রাষ্ট্র তার’ বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না। অপরাধের প্রমাণ ছাড়া কারোর ব্যক্তিকে সংক্রান্ত ব্যবহা একাধিক উপায়ে শাসকদের কাছে এসে পৌছেও তারা কোনভাবেই তার উপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন না। মদীনায় একটি মেয়ে ছিল। তার সম্পর্কে বলা হতো, সে ছিল প্রকাশ্য চরিত্রহীন। বুখারীর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : **كَانَتْ ظَاهِرًا فِي الْإِسْلَامِ السُّوءُ** “সে ইসলামে অসতীপনার প্রকাশ ঘটাইল।” অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে : **كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي إِسْلَامِهِ** কান্ত কেবল ইসলামে প্রকাশ্য অসদাচার করছিল।” আবার ইবনে মাজার একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

فَقَدْ ظَاهَرَ مِنْهَا الرِّبَيْبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يُدْخِلُ عَلَيْهَا

“মেয়েটির কথায় ও ব্যাব চরিত্রে এবং তার কাছে যারা যাওয়া আসা করতো তাদের থেকে সুস্পষ্ট সন্দেহ জেগে উঠেছিল।”

কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগারের প্রমাণ ছিল না তাই তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মূখ থেকেও এ কথা বের হয়ে গিয়েছিল যে, **لَوْكَنْتْ رَاجِمًا احْدًا بِغَيْرِ بِينَةٍ لَرَجَمْتَهَا** “যদি আমি কাউকে প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম তাহলে ঐ মেয়েটিকে নিচয়ই রজম করতাম।”

সতের : যিনার অপরাধের প্রথম সত্ত্বাব্য প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের উন্নতপূর্ণ অংশসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ :

(ক) কুরআন সুস্পষ্ট তায়ার বর্ণনা করে, যিনার জঘন্য কমপক্ষে চারজন চাকুর সাক্ষীর প্রয়োজন। সূরা নিসার ১৫ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে এ সূরা নূরেই দু’জায়গায় একথা আসছে। সাক্ষী ছাড়া কায়ী ব্যক্তে এ অপরাধ সংবটিত হতে দেখলেও কেবলমাত্র নিজের জানের ভিত্তিতে এ ফায়সালা দিতে পারেন না।

(খ) সাক্ষী হতে হবে এমন সব লোক ইসলামের সাক্ষ আইনের দ্বিতীয়ে যারা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন, ইতিপূর্বে কোন যামলায় তারা মিথ্যা সাক্ষদানকারী প্রমাণিত হয়নি। তারা খেয়ালতকারী নয়। ইতিপূর্বে তারা কখনো শাস্তি পায়নি। অপরাধীর সাথে যাদের কোন শক্তি প্রমাণিত হয়নি ইত্যাদি। মোটকথা অবিভূতযোগ্য সাক্ষের ভিত্তিতে কাউকে রজম করা বা কাঠোর পিঠে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে না।

(গ) সাক্ষীদের একথার সাক্ষ দিতে হবে যে, তারা অভিযুক্ত নারী ও পুরুষকে সংশ্মরণ অবস্থায় চাকুৰ দেখেছে অর্থাৎ **كَالْمُبِيلُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَالرَّشَاءِ** (الْمَكْحَلَةِ = কাল্মীল ফী মক্হলা এবং الرশাএ = রশাএ)। (এমনভাবে যেমন সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা তোলার শালাকা এবং কৃয়ার মধ্যে রশি)।

(ঘ) সাক্ষীদের কবে, কখন, কোথায়, কাকে, কার সাথে যিনি করতে দেখেছে এ ব্যাপারে একমত হতে হবে। এ মৌলিক বিষয়গুলোতে মতবিভোধ ঘটলে তাদের সাক্ষ বাতিল হয়ে যাবে।

সাক্ষ সম্পর্কিত এ শর্তগুলো স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, গোয়েন্দাবৃত্তি করে খুচিয়ে খুচিয়ে খবর বের করা এবং প্রতিদিন শোকদের পিঠে বেত্রাঘাত করা ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য নয়। বরং সে এমন অবস্থায় এ ধরনের কঠিন শাস্তি দেয় যখন সব ধরনের সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবশ্যন করার পরও ইসলামী সমাজে কোন নারী ও পুরুষ এমন নির্ভজ আচরণে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে যে, চার চারজন লোক তাদের অপরাধমূলক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

আঠার : ঝীলোকের যখন কোন জানা ও পরিচিত স্বামী বা বীণার অনুরূপ কোন মনিব থাকে না তখন নিছক তার গর্ভবতী হওয়াটাই তার বিরুদ্ধে যিনি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট পারিপার্শ্বিক সাক্ষ কিনা এ ব্যাপারে মতবিভোধ আছে। হযরত উমরের (রা) মতে এ সাক্ষ যথেষ্ট। মালেকীগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে, নিছক গৰ্ভধারণ এতটা মজবুত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ নয় যার ভিত্তিতে কাউকে রজম বা কাঠোর পিঠে একশ বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। এত বড় শাস্তির জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি অথবা অপরাধের স্বীকৃতি অপরিহার্য। ইসলামী আইনের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সন্দেহ শাস্তির নয় বরং ক্ষমার উদ্দীপক হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: **إِذْفَعُوا شَآسْتِيْسْمَعْهُ** "শাস্তিসমূহ এড়িয়ে চলো যতদূর সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে।" (ইবনে মাজাহ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

أَدِرِفُ الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُخْرَجٌ فَخَلُوا سَيِّلَةً، فَإِنْ الْأَمَامَ أَنْ يُخْطِيَ فِي الْعَفَةِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِيَ فِي الْعَقُوبَةِ

"মুসলমানদের থেকে যতদূর সম্ভব শাস্তি দূরে রাখো। যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবার কোন পথ পাওয়া যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কারণ শাসকের ক্ষমা করে দেবার ব্যাপারে ভুল করা তার শাস্তি দেবার ব্যাপারে ভুল করার চেয়ে ভালো।" (তিরমিয়ি)।

এ নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী হওয়া সন্দেহের জন্য যতই শক্তিশালী তিস্তি হোক না কেন তা কোনক্রমেই যিনার নিচিত প্রমাণ নয়। কারণ কোন পুরুষের সাথে সংগম ছাড়াও কোন মেয়ের গর্ভায়ে কোন পুরুষের শুক্রের কোন অংশ পৌছে যাওয়ার এক লাখ তাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও আছে এবং এর ফলে সে গর্ভবতীও হয়ে যেতে পারে। এতটুকু হালুকা সন্দেহও অপরাধিনীকে তয়াবহ শাস্তির হাত থেকে বীচাবার জন্য যথেষ্ট হতে হবে।

উনিশ : যিনার সাক্ষীদের মধ্যে যদি পার্থক্য দেখা দেয় অথবা অন্য কোন কারণে তাদের সাক্ষের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণে সাক্ষীরা কি শাস্তি পাবে এ ব্যাপারে মতভিন্নোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এ অবস্থায় তারা মিথ্যা অপবাদ দানকারী গণ্য হবে এবং তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। অন্য দলটি বলেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ তারা সাক্ষী হিসেবে এসেছে, বাস্তি হিসেবে আসেনি। যদি এভাবে সাক্ষীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে যিনার সাক্ষ দেবার দ্যুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। চারজন সাক্ষীর মধ্য থেকে কেউ বিগড়ে যাবে কিনা এ ব্যাপারে যখন কেউই নিচিত নয় তখন শাস্তির বৃক্ষ মাথায় নিয়ে সাক্ষ দেবার জন্য এগিয়ে আসবে, কে এমন দায়ে ঠেকেছে? আমার মতে এ বিতীয় মতটিই যুক্তিসংগত। কারণ সন্দেহের ফলে অপরাধীর মতো সাক্ষীদেরও লাভবান হওয়া উচিত। যদি তাদের সাক্ষের দুর্বলতা বিবাদীকে যিনার তয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তা হলে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদের তয়াবহ শাস্তি দেবার জন্যও যথেষ্ট না হওয়া উচিত। তবে যদি তাদের মিথ্যুক হওয়া দ্ব্যাধীনভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তারা এ শাস্তি পাবে। প্রথম মতের সমর্থনে দু'টি বড় বড় যুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, কুরআন যিনার মিথ্যা অপবাদকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করে। কিন্তু এ যুক্তিটি সঠিক নয়। কারণ কুরআন নিজেই মিথ্যা অপবাদদানকারী (فَإِنْ) ও সাক্ষীর (شَهِيد) মধ্যে পার্থক্য করে। আর আদালত সাক্ষীর সাক্ষকে অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করেনি, শুধুমাত্র এ কারণেই সাক্ষী মিথ্যা অপবাদদাতা গণ্য হতে পারে না। বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, মুগীরাহ ইবনে শু'বার (রা) মোকদ্দমায় হ্যরত উমর (রা) আবু বাক্রাহ ও তাঁর দু' সহযোগী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দানের শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ দেখলে বুঝা যায়, যেসব মোকদ্দমায় অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ অকিঞ্চিত প্রমাণিত হয় সে ধরনের প্রত্যেকটি মোকদ্দমার উপর এ নজিরটি প্রযোজ্য নয়। মোকদ্দমাটির বিবরণ হচ্ছে : বসরার গবর্নর মুগীরাহ ইবনে শু'বার সাথে আবু বাক্রাহর সম্পর্ক আগে থেকেই খারাপ ছিল। উভয়ের গৃহের অবস্থান ছিল একই পথের পাশে মুখোমুখি। একদিন হঠাৎ দম্ভকা বাতাসের বাটকায় উভয়ের গৃহের জানালা খুলে যায়। আবু বাক্রাহ নিজের জানালা বন্ধ করতে শুরু করেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ে সামনের কামরায়। তিনি হ্যরত মুগীরাহকে সংগ্রামত দেখেন। আবু বাক্রাহর কাছে বসেছিলেন তার তিনি বন্ধু (নাফে' ইবনে কুলাদাহ, যিয়াদ ও শিব্ল ইবনে মা'বাদ)। তিনি বলেন, এসো, দেখো এবং মুগীরাহ কি করছে তার সাক্ষী থাকো। বন্ধুরা জিজেস করেন, এ যেয়েটি কে? আবু বাক্রাহ বলেন, উম্মে জামিল। পরদিন এ সম্পর্কে হ্যরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগনামা পাঠানো হয়। তিনি সংগেই হ্যরত মুগীরাহকে সাসপেণ করে হ্যরত আবু মূসা আশ'আরীকে বসরার গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন এবং অভিযুক্তকে

সাক্ষীসহ মদীনায় ডেকে আনেন। খলীফার সামনে পেশ হবার পর আবু বাক্রাহ ও দু'জন সাক্ষী বলেন, আমরা মুগীরাহকে উম্মে জামিলের সাথে সংগ্রহত অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু যিয়াদ বলেন, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যায়নি এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না সে উম্মে জামিল ছিল। মুগীরাহ ইবনে শু'বা জেরার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন, যেদিক থেকে তারা তাদেরকে দেখছিলেন সেদিক থেকে তাদের পক্ষে মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি এটাও প্রমাণ করে দেন যে, তাঁর স্ত্রীর ও উম্মে জামিলের মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য রয়েছে। ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, হযরত উমরের (রা) শাসনামলে একটি প্রদেশের গবর্নরের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি যে সরকারী গৃহে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন, সেখানে অন্য একটি মেয়েকে ডেকে এনে যিনি করবেন। এ কারণে মুগীরাহ তার নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর পরিবর্তে উম্মে জামিলের সাথে সহবাস করছে, আবু বাক্রাহ ও তার সাথীদের এ কথা মনে করা একটি নিতান্ত অবস্থার কু-ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) কেবলমাত্র অভিযুক্তকেই অভিযোগমুক্ত করে ক্ষত হননি বরং আবু বাক্রাহ, নাফে ও শিবুলকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ও প্রদান করেন। এ যামলাটির বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এ ফায়সালা করা হয়েছিল। এ থেকে এরপ বিধি প্রণয়ন করা যায় না যে, যখনই সাক্ষের মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে না তখনই সাক্ষীদেরকে অবশ্য মারধর করতে হবে। (মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, ২য় খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)।

বিশ : সাক্ষ ছাড়া আর যে জিনিসটির মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে সেটি হচ্ছে অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি। যিনার কাজ করা হয়েছে বলে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যাধীন ভাষায় এ স্বীকারোক্তির শব্দাবলী উচ্চারিত হতে হবে। অর্থাৎ তাকে স্বীকার করতে হবে যে, তার জন্য হারাম ছিল এমন একটি নারীর সাথে সে **كالميل في المكحلة** (সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা শলাকার মতো) যিনার কাজ করেছে। আদালতেরও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধী কোন প্রকার বাইরের চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে বেঙ্গাপ্রণাদিত হয়ে সজ্জনে ও সচেতন অবস্থায় এ স্বীকৃতি দিচ্ছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয় বরং অপরাধীর চার বার আলাদা আলাদাতাবে স্বীকারোক্তি দেয়া উচিত। (এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ, ইবনে আবী লাইলা, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ ও হাসান ইবনে সালেহের অভিযত) আবার কেউ কেউ বলেন, একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট। (এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, উসমানুল বাস্তা ও হাসান বাসরী প্রমুখ ফকীহগণের অভিযত) তারপর এমন অবস্থায়ও যখন অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অপরাধীর নিজেরই স্বীকারোক্তির তিস্তিতে ফায়সালা করা হয়েছে তখন যদি ঠিক শাস্তির মাঝামাঝি সময়েও অপরাধী নিজের স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসে তাহলেও তার শাস্তি মূলতবী করে দেয়া উচিত। এমনকি যদি বুঝা যায় যে, মাঝের কষ্ট সইতে না পেতে সে নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসছে, তা হলেও তার শাস্তি মূলতবী হওয়া উচিত। হাদীসে যিনার মামলা সংক্রান্ত যেসব নজির পাওয়া যায় সেগুলোই এ সংস্কৃত আইনের উৎস। সবচেয়ে বড় মামলাটি হচ্ছে মা'ঈয ইবনে মালিক আসলামীর। বিভিন্ন সাহাবী থেকে অসংখ্য বর্ণনাকারী এটি উদ্ভৃত করেছেন। প্রায় সবকূটি হাদীসের কিতাবে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মা'ঈয ছিল আসলাম গোত্রের একটি এতিম

ছেলে। সে হযরত হায়াল ইবনে নু'আইমের গৃহে লালিত পালিত হয়। সেখানে এক মুক্তিপ্রাপ্তি বাদির সাথে যিনি করে বসে। হযরত হায়াল তাকে বলেন, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের এ শোনাহের কথা বলো। হয়তো তিনি তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে দেবেন। মা'ঈয় মসজিদে নববীতে গিয়ে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন, আমি যিনি করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তারপর বলেন, **وَحْكَارِجِعْ فَاسْتَغْفِرْ**, **اللَّهُ وَتَبَّالِهِ** "আরে, চলে যাও, আর আল্লাহর কাছে তাওও ও ইস্তিগফার করো।" কিন্তু ছেলেটি আবার সামনে এসে একই কথা বলে এবং এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। ছেলেটি আবার সে কথাই বলে এবং তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা) তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, দেখো, যদি তুমি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করো তাহলে রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে রজু করে দেবেন। কিন্তু সে মানেনি এবং আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। এবার নবী (সা) তার দিকে ফেরেন এবং তাকে বলেন, **لِعَلَكَ قَبْلَتْ أَوْ غَمْزَتْ أَوْ نَظَرْتْ** "স্মষ্টবত তুমি চুমো খেয়েছো বা জড়াজড়ি করেছো অথবা কু-নজর দিয়েছো।" (এবং তুমি মনে করেছো এতেই বুঝি যিনি করা হয়ে পেছে সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, **تَعْمِي** কি তার সাথে এক বিছানায় শয়েছো?" জবাব দেয়, হী। জিজ্ঞেস করেন, **تَعْمِي** কি তার সাথে সহবাস করেছো?" জবাব দেয়, হী। জিজ্ঞেস করেন, **تَعْمِي** কি তার সাথে সংগম করেছো?" জবাব দেয় হী। তারপর তিনি এমন শব্দ উচ্চারণ করেন যা আরবী ভাষায় সংগম করার সুস্পষ্ট প্রতিশব্দ হিসেবে বলা হয়ে থাকে এবং তাকে অশ্রু মনে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের শব্দ নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে এর আগে কেউ শোনেনি এবং পরেও আর কখনো শোনা যায়নি। যদি এক ব্যক্তির প্রাণনাশের প্রশ্ন না হতো তাহলে তাঁর মুবারক কঠে কখনো এ ধরনের শব্দ উচ্চারিত হতে পারতো না। কিন্তু এর জবাবেও সে হী বলে দেয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, **حَتَّىٰ غَابَ ذَالِكَ مِنْهَا** (এমন কি তোমার সেই অংশ তার সেই অংশের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?) সে বলে, হী। আবার জিজ্ঞেস করেন,

كَمَا يَغِيبُ الْمَيْلُ فِي الْمَكْحُلَةِ وَالرُّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟

(সেটা কি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেমন সুর্মাদানীতে সুর্মাশলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি!) সে বলে, হী। জিজ্ঞেস করেন, **سَمِينَا** কাকে বলে তুমি কি জানো?" সে বলে, **سَمِيْ** হী।" আমি তার সাথে হারাম পদ্ধতিতে এমন কাজ করেছি যা স্বামী হালাল পদ্ধতিতে নিজের স্ত্রীর সাথে করে থাকে।" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি বিয়ে হয়েছে?" জবাব দেয়, **سَمِيْ** হী। জিজ্ঞেস করেন, **تَوْمِي** তো মদ পান করনি?" জবাব দেয়, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখ শুকে দেখেন এবং তার কথা সত্যতার সাক্ষ দেন। তারপর তিনি তার মহস্তার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এ ছেলেটি পাগল নয় তো? মহস্তার লোকেরা বলে, আমরা তার বুদ্ধির মধ্যে কোন বিকৃতি দেখিনি। তিনি হায়ালকে বলেন, **لَوْسَرَتْ بِشْوِبِكْ** **كَانْ خِيرَ الْكَافِرِ** "যদি তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে তাহলে তোমার জন্য তালো হতো।" তারপর তিনি মা'ঈয়কে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাকে নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হয়। যখন পাথর পড়তে শুরু হয় তখন মা'ঈয় দৌড়ে পালাতে থাকে এবং বলতে থাকে "লোকেরা! আমাকে রসূলুল্লাহ (সা)

কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। তারা আমাকে ধোকা দিয়েছে তারা বলেছিল, রসূলগ্রাহ (সা) আমাকে হত্যা করবেন না।” কিন্তু যার্রা পাথর মারছিল তারা তাকে মেরেই ফেলে। পরে যখন নবীকে (সা) এ খবর জানানো হয় তখন তিনি লোকদের বলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? তাকে আমার কাছে আনতো। হয়তো সে তাওবা করতো এবং আল্লাহর তার তাওবা কুল করে নিতেন।”

হিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে গামেদীয়ার। গামেদীয়া ছিল গামেদ গোত্রের (জুহাইনীয়া গোত্রের একটি শাখা) একটি মেয়ে। সে এসেও চারবার ঝীকারোক্তি করে যে, সে যিনি করেছে এবং অবৈধ গর্তধারণ করেছে। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও প্রথম ঝীকারোক্তির সময় বলেন : **وَيَحْكُمْ أَرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي إِلَى اللَّهِ وَتُؤْبِي إِلَيْهِ** (আরে চলে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।) কিন্তু সে বলে, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে মাঝের মতো এড়িয়ে যেতে চান? আমি যিনির মাধ্যমে পর্তবী হয়েছি।” এখানে যেহেতু ঝীকারোক্তির সাথে গর্তধারণের ব্যাপারটিও ছিল, তাই তিনি তাকে মাঝের মতো বিভারিত জেরার সম্মুখীন করেননি। তিনি বলেন, “ঠিক আছে, যদি একস্থাই না শুনতে চাও, তাহলে স্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে এসো।” স্তান জন্মের পর সে শিশুটিকে কোলে নিয়ে এসে বলে, এবার আমাকে পবিত্র করে দিন। তিনি বলেন, “যাও, একে দুখ পান করাও এবং শিশু দুখ ছাড়ার পরে এসো।” তারপর সে শিশুর দুখ ছাড়ার পরে আসে এবং সাথে এক টুকরা রুটিও নিয়ে আসে। শিশুকে রুটির টুকরা খাইংসে রসূলগ্রাহকে (সা) দেখান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এখন তো এ দুখ ছেড়ে দিয়েছে এবং দেখুন রুটিও খেতে শুরু করেছে। তখন তিনি শিশুটিকে লাঙ্গন পালন করার জন্য এক ঝক্কির হাতে সোপার্দ করেন এবং তাকে রজম করার হকুম দেন।

এ দু'টি ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে চারটি ঝীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে। আর আবু দাউদে ইহত বুরাইদার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ সাধারণতাবে মনে করতেন যদি মাঝে ও গামেদীয়া চারবার করে ঝীকারোক্তি না করতো। তাহলে তাদেরকে রজম করা হতো না। তবে ত্তীয় ঘটনাটিতে যার উল্লেখ আমি ওপরে পনের নব্বরে করেছি শুধুমাত্র এ শব্দগুলো পাওয়া যায় যে, “যাও তার ঝীকার গিয়ে জিজ্ঞেস করো। যদি সে ঝীকার করে তাহলে একে রজম করো।” এখানে চারবার ঝীকারোক্তির কথা বলা হয়নি। এ খেকেই ফকীহগণের একটি দল একটি ঝীকারোক্তি যথেষ্ট বলে মত প্রকাশ করেছেন।

একুশ : ওপরে আমি যে তিনটি যামলার নজির পেশ করেছি তা থেকে প্রমাণ হয় যে, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী অপরাধীকে সে কার সাথে যিনি করেছে সে কথা জিজ্ঞেস করা হবে না। কারণ এভাবে এক জনের পরিবর্তে দু'জনকে শাস্তি দিতে হবে। আর শরীয়াত লোকদেরকে শাস্তি দেবার জন্য উদ্দীপ্তি নয়। তবে অপরাধী নিজেই যদি বলে যে, এ কর্মের অপর পক্ষ অযুক্ত জন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সে ও ঝীকারোক্তি করে তাহলে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যদি সে অশীকার করে তাহলে কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় ঝীকারোক্তিকারী অপরাধীই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। এ হিতীয় অবহায় (অর্থাৎ যখন হিতীয় পক্ষ তার সাথে যিনি করার কৰ্ত্তা ঝীকার করে না) তাকে যিনির না মিথ্যা অপবাদের (ফড়) শাস্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিভোধ

রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেইর মতে তার জন্য যিনার শান্তি উপরাজিব হয়ে যাবে। কারণ সে এ অপরাধের কথা কীকার করেছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওয়া'ইর মতে তাকে মিথ্যা অপবাদের শান্তি দেয়া হবে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের অধীক্ষিত তার যিনার অপরাধকে সন্দেহযুক্ত করে দিয়েছে। তবে তার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ অবশ্যই প্রমাণিত হয়ে গেছে। অন্য দিকে ইমাম মুহাম্মদের ফতুওয়া (ইমাম শাফে'ইর একটি উকিল এর সমর্থনে পাওয়া যায়) হচ্ছে এই যে, তাকে যিনার শান্তিও দিতে হবে এবং মিথ্যা অপবাদের শান্তিও। কারণ নিজের যিনার অপরাধের কীকারোক্তি সে নিজেই করেছে এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ সে প্রমাণ করতে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে এ ধরনের একটি মামলা এসেছিল। তার একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে সাহল ইবনে সাদ থেকে নিম্নোক্ত শৃঙ্খলারী সহকারে উল্লিখিত হয়েছে : “এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কীকারোক্তি করে, সে অমুক মেয়ের সাথে যিনা করেছে। তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। সে অধীক্ষিত করে। তিনি লোকটিকে শান্তি দেন এবং মেয়েটিকে মুক্তি দিয়ে দেন।” এ হাদীসে তিনি কোনু শান্তিটি দেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতেও আবু দাউদ ও নাসাই ইবনে আবাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রথমে তার কীকারোক্তির তিক্ষ্ণতে তিনি তাকে যিনার শান্তি দেন। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে সে অধীক্ষিত করে এবং এর ফলে লোকটিকে আবার মিথ্যা অপবাদের জন্য বেত্তাধাত করেন। কিন্তু এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে ফাইয়াকে বহু মুহান্দিস অনিতরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। আবার এ হাদীসটি যুক্তিরও বিরোধী। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, তিনি যিনার জন্য বেত্তাধাত করার পর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবেন। বৃক্ষবৃক্ষি ও ইনসাফের যে সুস্পষ্ট দাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপেক্ষা করতে পারেন না তা ছিল এই যে, লোকটি যখন মেয়েটির নাম নিয়েছিল তখন তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস না করে মামলার ফাইলস্লার করতে পারতেন না। সাহল ইবনে সাদ বর্ণিত রেওয়ায়াতটি কিন্তু একথাই সমর্থন করছে। কাজেই দ্বিতীয় বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাইশ : অপরাধ প্রমাণ হবার পর যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে কি শান্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফকীহের মতামত নিচে পেশ করছি :

বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যিনার শান্তি : ইমাম আহমদ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক ইবনে রাহিউওয়াইহের মতে এর শান্তি হচ্ছে একশ বেত্তাধাত এবং তারপর প্রত্নরাধাতে মৃত্যু।

অন্য সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কেবলমাত্র প্রত্নরাধাতে মৃত্যুই তাদের শান্তি। বেত্তাধাত ও প্রত্নরাধাতে মৃত্যুকে একত্র করা যাবে না।

অবিবাহিতদের শান্তি : ইমাম শাফেই, ইমাম আহমদ, ইসহাক, দাউদ যাহেরী, সুফিয়ান সউরী, ইবনে আবী লাইলা ও হাসান ইবনে সালেহের মতে, নারী ও পুরুষ উভয়ের শান্তি একশত বেত্তাধাত ও এক বছরের দেশাস্তর।

“ইমাম মালেক ও ইমাম আওয়াজির মতে, পুরুষের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশাস্তর এবং নারীর জন্য শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। (তাদের সবার মতে দেশাস্তর অর্থ হচ্ছে, একটি স্নোকালয় থেকে বের করে কমপক্ষে এমন এক দূরত্বে পৌছে দেয়া যেখানে নামাযে কসর করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু যায়েদ ইবনে আলী ও ইমাম জা'ফর সাদেকের মতে কারাগারে বল্পি করলেও দেশাস্তরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়)।

ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুক্তার ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, এ অবস্থায় পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যিনার শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। এর উপর কারাদণ্ড বা দেশাস্তরের বাড়তি শাস্তি বা অন্য কোন শাস্তি আসলে ‘হ’ বা শরিয়াতী দণ্ড নয় বরং ‘তায়ির’ বা শাসনযুক্ত দণ্ড। কায়ি যদি দেখেন অপরাধীর চালচলন খারাপ অথবা অপরাধী ও অপরাধিনীর সম্পর্ক অত্যুষ্ণ গভীর তাহলে প্রয়োজন মাফিক তিনি তাদেরকে দেশত্যাগী করতে অথবা কারাদণ্ড দিতে পারেন।

(হদ ও তা'য়ীরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, হদ একটি নির্ধারিত শাস্তি। অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী পূর্ণ হবার পর অনিবার্যভাবে এ শাস্তি দেয়া হবে। আর তা'য়ীর এমন শাস্তিকে বলা হয় যা পরিমাণ ও ধরনের দিক দিয়ে আইনের মধ্যে মোটেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। বরং আদালত মামলার অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর মধ্যে কম-বেশী করতে পারে।)

এসব মতাবলীরা তাদের মতামত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসের সহায়তা নিয়েছেন। নীচে আমি সেগুলো উন্নত করছি :

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেতের রেওয়ায়াত। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিয়ী ও ইমাম আহমাদ এটি উন্নত করেছেন। এতে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

خُنُوا عَنِّي خُنُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدٌ
مَاءٌ وَتَغْرِيبٌ غَامٌ وَالثَّئِيبُ بِالثَّئِيبِ جِلْدٌ مَاءٌ وَالرَّجْمُ (اورমি بالحجارة)
(اورجم بالحجارة)

“আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও, আল্লাহ যিনাকারিনীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষের অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যতিচারের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশাস্তর। আর বিবাহিত পুরুষের বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যতিচারের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও প্রতরাঘাতে মৃত্যু।”

(এ হাদীসটি যদিও বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে সহীহ কিন্তু বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস আমাদের একথা জানাচ্ছে যে, একে নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কখনো কার্যকর করা হয়নি এবং ফকীহদের একজনও হবহ এর বক্তব্য অনুযায়ী ফতুওয়াও দেননি। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের এ সংক্রান্ত যে বিষয়ে সবাই একমত সেটি হচ্ছে এই যে, যিনাকারী ও যিনাকারিনীর বিবাহিত ও অবিবাহিত হবার ব্যাপারটির উপর আলাদা আলাদাভাবে দৃষ্টি দেয়া হবে। অবিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে কোন নারীর

সাথে যিনা কর্মক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার শান্তি একই হবে। আর বিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত বা বিবাহিতা যে কোন নারীর সাথে যিনা কর্মকনা কেন উভয় অবস্থায়ই একই শান্তি হবে। নারীর ব্যাপারেও এ একই কথা। সে বিবাহিতা হলে তার সাথে অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ যেই যিনা কর্মক না কেন উভয় অবস্থায়ই একই শান্তি হবে। আর সে অবিবাহিতা হলে তার সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন পুরুষ যিনা করলেও উভয় অবস্থায়ই তার একই শান্তি হবে।)

হয়রত আবু হুরায়রা (রা) ও হয়রত খালেদ জুহানীর (রা) হাদীস। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ এটি উদ্ভৃত করেছেন। এ হাদীসে বলা হয়েছে : দু'জন শ্রামীন আরব নবী সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বামের কাছে একটি মাল্লা নিয়ে আসে। একজন বলে, আমার ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে এর জীর সাথে জড়িয়ে পড়ে। আমি একে একশ ছাগল ও একটি বাঁদি দিয়ে রাজি করিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আলেমগণ বলছেন, এ শীমাংসা আল্লাহর কিতাব বিরোধী। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। অন্যজনও বলে, আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো। ছাগল ও বাঁদি তুমি ফেরত নিয়ে যাও। তোমার ছেলের শান্তি হচ্ছে, একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর। তারপর তিনি আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলেন, হে উনাইস। তুমি গিয়ে এর জীকে জিজেস করো। যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করে দাও। দেখা পেলো তার স্ত্রী স্বীকারোক্তি করেছে। ফলে তাকে রজম করা হলো। (এখানে রজম করার আগে বেত্রাঘাতের কোন কথা নেই। আর অবিবাহিত পুরুষকে বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যতিচার করার ফলে বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শান্তি দেয়া হয়।)

মাঝে ও গামেদীয়ার মামলার যতগুলো বিবরণী হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উদ্ভৃত হয়েছে তার কোনটিতেও একথা পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সা) রজম করার আগে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করার ব্যবস্থাপন করেছিলেন।

কোন হাদীসে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, নবী সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বাম কোন মামলায় রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শান্তিও দেন। বিবাহিতের যিনার শান্তিতে তিনি শুধুমাত্র রজমের শান্তিই দেন।

হয়রত উমর (রা) তাঁর বহু প্রচারিত ভাষণে বিবাহিতের যিনার শান্তি রজম বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী ও নাসাই বিভিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় এটি উদ্ভৃত করেছেন। ইমাম আহমাদও এ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর কোন একটি বর্ণনায়ও রজমের সাথে বেত্রাঘাতের উল্লেখ নেই।

খোলাফায়ে রাশেদানের মধ্যে একমাত্র হয়রত আলী (রা) বেত্রাঘাত ও রজমকে একই শান্তির আওতায় একত্র করেছেন। ইমাম আহমাদ ও বুখারী আমের শাব্দী থেকে এ ঘটনা উদ্ভৃত করেছেন যে, শুরাহাহ নামক এক মহিলা অবৈধ গর্ভের স্বীকারোক্তি করে। হয়রত আলী (রা) বৃহস্পতিবার দিন তাকে বেত্রাঘাত করান এবং শুভ্রবার রজমের শান্তি দেন আর তারপর বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাতের এবং

০০
রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রজমের শাস্তি দিয়েছি। এ একটি ঘটনা ছাড়া খেলাফতে রাশেদার সমগ্র আমলে রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তির পক্ষে দ্বিতীয় কোন ঘটনা পাওয়া যায় না।

জ্ঞাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) একটি রেওয়ায়াত। আবু দাউদ ও নাসাই এটি উন্নত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যিনি করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন। তারপর জানা যায়, সে বিবাহিত ছিল। তখন তিনি তাকে রজমের শাস্তি দেন। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন হাদীস উন্নত করেছি। সেগুলো থেকে জানা যায়, অবিবাহিত যিনাকারীদেরকে তিনি কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন। যেন যে ব্যক্তি মসজিদে গমনকারী এক মহিলার সাথে বলপূর্বক যিনি করেছিল এবং যে ব্যক্তি যিনার স্বীকারোক্তি করেছিল এবং মেয়েটি করেছিল অস্বীকার।

হযরত উমর (রা) বারী'আহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খালফকে মদ পানের অপরাধে দেশাস্তির করেন এবং সে পাসিয়ে গিয়ে রোমানদের সাথে যোগ দেয়। এর ফলে হযরত উমর (রা) বলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কাউকে দেশাস্তরের শাস্তি দেবো না। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে যিনার অপরাধে দেশাস্তর করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, এর ফলে ফিত্নার আশংকা আছে। (আহকামুল কুরআন-জাস্মাস, তয় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত হাদীসের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে পরিকার অনুভূত হয়, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের অভিমতই সঠিক। অর্থাৎ বিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র রজম এবং অবিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। বেত্রাঘাত ও রজমকে একসাথে নবীর (সা) আমল থেকে হযরত উসমানের (রা) আমল পর্যন্ত কখনো কার্যকর করা হয়নি। আর বেত্রাঘাত ও দেশাস্তরের শাস্তিকে কখনো একত্র করা হয়েছে আবার কখনো একত্র করা হয়নি। এ থেকে হানাফী অভিমতের নির্ভুলতা পরিকার প্রমাণিত হয়।

তেইশ : বেত্রাঘাতের ধরন সম্পর্কে প্রথম ইংরিজি কুরআনের শব্দ **فَاجْلِنُوا** এর মধ্যে পাওয়া যায়। **জ্বল্জ** (জ্বল্দ) শব্দটি **জ্বল্জ** (জ্বল্দ অর্থাৎ চামড়া) থেকে গৃহীত। এ থেকে সকল অভিধান বিশারদ ও কুরআন ব্যাখ্যাতা এ অর্থই নিয়েছেন যে, আঘাত এমন হতে হবে যার প্রতাব চামড়ার শুগর থাকে, গোশ্তের মধ্যে না পোছে। এমন ধরনের বেত্রাঘাত যার ফলে গোশ্তের টুকরা উড়ে যেতে থাকে অথবা চামড়া ফেটে আঘাত তেতরে পোছে যায়, তা কুরআন বিরোধী।

আঘাত করার জন্য কোড়া বা বেত যাই ব্যবহার করা হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই তা মাঝারি পর্যায়ের হতে হবে। বেশী মোটা ও বেশী তীক্ষ্ণ অথবা বেশী পাতলা ও বেশী নরম হতে পারবে না। মূল্যান্তা এবং ইমাম মালেক রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেত্রাঘাতের জন্য কোড়া আনতে বলেন। সেটি বেশী ব্যবহার করার কারণে অনেক বেশী হালুকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, এ (এর চাইতে বেশী তীক্ষ্ণ দেখে আনো)। তখন একটি নতুন কোড়া আনা হয়। সেটি তখনো কোন প্রকার ব্যবহারের ফলে নরম হয়ে যায়নি। তিনি বলেন, এ দু'য়ের মাঝামাঝি। তারপর এমন কোড়া আনা হয় যা সওয়ারীর পিঠে ব্যবহার করা হয়েছিল। তা দিয়ে তিনি আঘাত করান। প্রায় একই বিষয়বস্তু সংযুক্ত একটি বর্ণনা আবু উসমান আন্নাহদী হযরত উমর (রা)

সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি প্রায় মাঝারি ধরনের কোড়া ব্যবহার করতেন। (আহকামুল কুরআন-জাসুসাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা) গাট বৈধানো কোড়া অথবা দু'চামড়া-তিন চামড়া বা দু'রশি-তিন রশি বৈধানো কোড়া ব্যবহার করা নিষেধ।

আঘাতও হতে হবে মাঝারি পর্যায়ের। হ্যরত উমর (রা) আঘাতকারীকে নির্দেশ দিতেন অর্থাৎ "এমনভাবে মাঝো যেন তোমার বগল খুলে না যায়।" অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে হাত উচ্চিয়ে মেরো না। (আহকামুল কুরআন-ইবনে আবাবী, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, আহকামুল কুরআন-জাসুসাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ধরনের আঘাত হবে না যাই ফলে ঘা হয়ে যায়। একই জায়গায় মাঝা যাবে না বরং সারা শরীরে মাঝ ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র চেহারা ও লজ্জাহান এবং (হানাফীদের মতে মাঝাও) অক্ষত রাখতে হবে। বাদবাকি সমস্ত অংশে কিছু না কিছু মাঝ পড়তে হবে। এক ব্যক্তিকে যখন কোড়া মাঝা হচ্ছিল তখন হ্যরত আলী (রা) বলেন, "শরীরের প্রত্যেক অংশকে তার প্রাপ্য দাও এবং শুধুমাত্র মুখ ও লজ্জাহানকে নিষ্ঠিত দাও।" (আহকামুল কুরআন-জাসুসাস, ৩য় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা) নবী সান্নাহিন আলাইহি উয়া সান্নাম বলেন : "إذْ ضرَبَ أَحَدُكُمْ فِلْيَقَ الرَّجْلِ" "তোমাদের কেউ যখন আঘাত করবে তখন মুখে আঘাত করবে না।" (আবু দাউদ)

পুরুষকে দৌড় করিয়ে ও স্ত্রী লোককে বসিয়ে মাঝা উচিত। ইমাম আবু হানীফার সময় কুফার কায়ি ইবনে আবী শাইলা একটি মেয়েকে দৌড় করিয়ে মাঝার ব্যবস্থা করেন। ইমাম আবু হানীফা এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং প্রকাশ্যে তার এ কার্যক্রমকে ভুল বলে চিহ্নিত করেন। (এ থেকে আদালতের অমর্যাদা সংক্রান্ত ইমাম আবু হানীফার মতবাদের উপরও আলোকপাত হয়)। কোড়া মাঝার সময় স্ত্রীলোক তার পূর্ণ পোশাক পরে থাকবে। বরং তার শরীরের কোন অংশ যাতে বের হয়ে না যায় এ জন্য কাপড় তার সারা শরীরে ভালোভাবে বেঁধে দেয়া হবে। শুধু মোটা কাপড় খুলে নিতে হবে। পুরুষের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, পুরুষ কেবল পাজামা পরে থাকবে। আবার অন্যেরা বলেন, জামাও খোলা যাবে না। হ্যরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জারাই (রা) এক যিনাকারীকে কোড়া মাঝার হকুম দেন। সে বলে, "এই শরীরটার ভালোভাবে মাঝ খাওয়া উচিত।" একথা বলে সে জামা খুলতে শুরু করে। হ্যরত আবু উবাইদাহ বলেন, "তাকে জামা খুলতে দিয়ো না।" (আহকামুল কুরআন-জাসুসাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। হ্যরত আলীর আমলে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিল এ অবস্থায় তাকে কোড়া মাঝা হয়।

প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মাঝা নিষিদ্ধ। শীতকালে গরম সময়ে এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডার মধ্যে মাঝতে হবে।

বেঁধে মাঝারও অনুমতি নেই। তবে অপরাধী যদি পাশিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে বেঁধে মাঝা যেতে পারে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "إِنَّمَا يَحْلِفُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ تَجْرِيدًا وَلَمْ يَمْسِ" "এই উম্মতের মধ্যে উলংঘ করে এবং খুটির সঙ্গে বেঁধে মাঝা জায়েয় নয়।"

ফকীহগণ প্রতিদিন অন্ততপক্ষে বিশ ঘা কোড়া মাঝা বৈধ বলেছেন। কিন্তু একই সংগে সম্পূর্ণ শাস্তি দিয়ে দেয়া উন্নত।

মূর্খ ও হিংস্র ধরনের জন্মদের সাহায্যে মারার কাজ সম্পর্ক করা উচিত নয়। বরং শিক্ষিত ও মজিত জ্ঞানবান লোকদের সাহায্যে এ কাজ সম্পর্ক করা উচিত। যারা জানে শরীয়াতের দাবী পূর্ণ করার জন্য কিভাবে মারা উচিত তারাই এ কাজ করবে। ইবনে কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় হযরত আলী (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (রা), হযরত আসেম ইবনে সামেত ও ঘাহহাক ইবনে সুফিয়ানের ন্যায় সজ্জন ও মর্যাদাশালী গোকেরা জন্মদের দায়িত্ব পালন করতেন। (১ম খণ্ড, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)।

যদি অপরাধী রূপ্ত হয় অথবা তার আরোগ্য লাভ করার কোন আশা না থাকে কিংবা একেবারে বৃদ্ধ হয় তাহলে একশ শাখাওয়ালা একটি ডাল বা শতকাঠিওয়ালা একটি বাড়ু দিয়ে তাকে কেবলমাত্র একবার মেরে দেয়াই উচিত, যাতে আইনের দাবী পূর্ণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এক বৃদ্ধ মেরীগী যিনার অপরাধে পাকড়াও হয়। তিনি তার জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ) গর্ভবতী নারীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর নিফাসের সময় পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তাকে রজু করতে হলে যতক্ষণ তার স্মরণ দুধ পান করা পরিয়াগ না করে ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারবে না।

যদি সাক্ষের মাধ্যমে যিনি প্রমাণ হয় তাহলে সাক্ষী মারের সূচনা করবে আর যদি শীকারোভিল মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে কায়ী নিজেই সূচনা করবেন, যাতে সাক্ষী নিজের সাক্ষকে এবং বিচারক নিজের বিচারকে খেল-তামাশা মনে না করেন। শুরাহাহর মামলায় যখন হযরত আলী (রা) রজমের ফায়সালা দেন তখন বলেন, “যদি তার অপরাধের কোন সাক্ষী থাকতো তাহলে তাকেই মার শুরু করতে হতো। কিন্তু তাকে শীকারোভিল ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কাজেই আমি নিজেই শুরু করবো।” হানাফীয়াদের মতে এমনটি করা ওয়াজিব। শাফেঈরা একে ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু সবাই একে উত্তম মনে করেন।

বেত্রাঘাতের শাস্তির এ বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন তারপর যারা এ শাস্তিকে বর্বরোচিত বলে থাকে তাদের ধৃষ্টাতার কথা ভাবুন। আজকাল কারাগারে কয়েদীদেরকে যে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা তাদের কাছে বড়ই ভদ্রোচিত। বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র আদালতই নয়, জেলখানার একজন মামুলি সুপারিনেটেন্ডেন্টও একজন কয়েদীকে হকুম অমান্য বা গোপ্যাধীন করার অপরাধে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত বেত্রাঘাতের শাস্তি দেবার অধিকার রাখে। এ বেত্রাঘাত করার জন্য একজন লোককে বিশেষভাবে তৈরী করা হয় এবং সে সবসময় এটা মশুক করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে বেতও বিশেষভাবে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তৈরী করা হয়, যাতে করে শরীরের উপর তা ছুরির মতো কেটে বসে যেতে পারে। অপরাধীকে নাংগা করে খুটির সাথে বেঁধে দেয়া হয়, যাতে সে একটু নড়াচড়াও করতে না পারে। কেবলমাত্র তার লজ্জাহান ঢাকার জন্য এক টুকরা পাতলা কাপড় তার পাছার সাথে জড়িয়ে দেয়া হয় এবং সেটিকেও টিচার আইওডিন দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। জন্মদূর থেকে দৌড়ে আসে এবং পূর্ণ শক্তিতে তার উপর আঘাত করে। শরীরের একটি বিশেষ অংশে (অর্থাৎ পাছায়) বরাবর আঘাত করা হতে থাকে। ফলে সেখান থেকে

গোশ্ত কিমা হয়ে উড়ে যেতে থাকে এবং অনেক সময় তেতুর থেকে হাড় দেখা যেতে থাকে। অধিকাংশ সময় এমন হয়, অত্যন্ত বলশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিও ৩০ ঘা বেত সম্পূর্ণ হবার আগেই বেশ হয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থায় তার শরীর ভরাট হতে দীর্ঘ সময় লাগে। তথাকথিত এ ভদ্রজনোচিত শাস্তিকে যারা আজ কারাগারে নিজেরাই প্রবর্তিত করে চলেছে তারা কোন্ মুখে ইসলাম প্রবর্তিত বেতাধাতের শাস্তিকে “বর্বরোচিত” বলার ধৃষ্টভা দেখাতে পারে। তারপর তাদের পুলিশ বাহিনী যেসব অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাদেরকে নয় বরং নিছক সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরে এনে অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে (বিশেষ করে রাজনৈতিক অপরাধ সন্দেহে) যেতাবে শাস্তি দিয়ে থাকে তা আজ আর কারোর দৃষ্টির অগোচরে নেই।

চরিশ : রজমের শাস্তির ফলে অপরাধী মারা যাবার পর তার সাথে পুরোপুরি মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হবে। তার লাশকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হবে। তার জানায়ার নামায পড়া হবে। তাকে মর্যাদা সহকারে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। দুর্নাম সহকারে তার কথা আলোচনা করা কারোর জন্য বৈধ হবে না। বুখারীতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর (রা) রেওয়ায়াত উন্মুক্ত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, “রজমের ফলে মা’ঈয ইবনে মালেকের মৃত্যু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনামের সাথে তাকে শ্যরণ করতে থাকেন এবং নিজে তার জানায়ার নামায পড়ান।” মুসলিমে হ্যরত বুরাইদার রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اِسْتَغْفِرُوا لِمَا عَزَّ بِنِ مَالِكَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ اُمَّةٍ لَوْ سَعَتُهُمْ

“মা’ঈয ইবনে মালেকের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। সে এমন তাওবা করেছে যে, যদি তা সমগ্র উম্মতের ওপর বট্টন করে দেয়া হয়, তাহলে সবার জন্য যথেষ্ট হবে।”

এ হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, গামেদীয়া যখন রজম করার ফলে মারা যান তখন নবী করীম (সা) নিজেই তার জানায়ার নামায পড়ান। আর হ্যরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) যখন দুর্নাম সহকারে তার কথা বলতে থাকেন তখন তিনি বলেন :

مَهْلَأْ يَا خَالِدُ ! فَوَالذِّي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَاً بَهَا صَاحِبُ
مَكْسُرٍ لَغَرَبَةِ -

“হে খালেদ! চূপ করো। সেই সন্তার কসম, যার হাতে রয়েছে আয়ার প্রাণ, সে এমন তাওবা করেছিল যে, যদি নিপীড়নমূলক কর আদায়কারীও তেমন তাওবা করতো তাহলে তাকেও মাফ করে দেয়া হতো।”

আবু দাউদে হ্যরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মা’ঈযের ঘটনার পর একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দু’জন লোককে মা’ঈযের দুর্নাম করতে শনলেন। কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটি গাধার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। রসূলুল্লাহ (সা) ধেমে গেলেন এবং ঐ

“দু’জন গোকের উদ্দেশে বললেন, ‘তোমরা দু’জন এটা থেকে কিছু খাও।’ তারা বললেন, ‘হে আল্লাহর নবী! ওটা কে থেতে পাবে।’ তিনি বললেন, ‘এখনই তো তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ইচ্ছত-আবরু খাচ্ছিলো। ওটা এর চেয়ে অনেক খারাপ জিনিস ছিলো।’ মুসলিমে ঈমরান ইবনে হসাইন বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রা) গামেদীয়ার জানায়ার নামায়ের সময় বলেন : হে আল্লাহর রসূল! এখন কি এই যিনাকারিনীর জানায়ার নামায পড়া হবে? তিনি জবাব দেন :

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِّمْتَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ سَعْتُهُمْ

“সে এমন তাওবা করেছে, যা সমগ্র মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলেও তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।”

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তিকে মদপানের অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তা দেখে একজনের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, “আল্লাহ তোমাকে শাস্তিত কর্মন!” একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “এভাবে বলো না। এর বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।” আবু দাউদে এর উপর আরো এতেকুন সংযোজন আছে যে, নবী (সা) বলেন, বরং এভাবে বলো : ، اللهم اغفر لـ“হে আল্লাহ তাকে মাফ করো, হে আল্লাহ। তার প্রতি রহম করো।” এ হচ্ছে ইসলামে শাস্তির তাৎপর্য। ইসলাম কোন বৃহত্তম অগ্রাধীকেও শক্রতার মনোভাব নিয়ে শাস্তি দেয় না। বরং কল্যাণকাংশের মনোভাব নিয়েই শাস্তি দেয়। আর শাস্তি শেষ হবার পর তার প্রতি মেহ ও মহত্তর দৃষ্টিতে দেখে। আধুনিক সভ্যতাই বর্তমানে এমন এক সংকীর্ণমনতার জন্য দিয়েছে যার ফলে সরকারী সৈন্য বা পুলিশ যাকে হত্যা করে এবং বিচার বিত্তীয় তদন্তের ফলে যাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য করা হয় তার শাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া বা কাঠোর মুখে তার প্রশংসা কীর্তিত হওয়াকে কোনক্রমেই পছন্দ করা হয় না। এরপর দুনিয়াবাসীকে সহিষ্ণুতা ও উদারতার নিষিদ্ধ করে নিজের নৈতিক সাহসের (এটা আধুনিক সভ্যতায় ধৃষ্টতা ও নির্মজ্জন মার্জিত নাম) পরাকৃষ্টা দেখানো হয়।

পঞ্চিশ : মুহাররম নারীদের সাথে যিনার শাস্তি সম্পর্কিত শরীয়াতের আইন তাফহীমুল কুরআনের সূরা নিসার ৩৪ টীকায় এবং শূতের জাতির কর্ম (সমকাম) সংক্রান্ত শরিয়াতী ফায়সালা! তাফহীমুল কুরআনের সূরা আ’রাফের ৬৪ থেকে ৬৮ টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর পশুর সাথে ব্যভিচার করাকেও কোন কোন ফকীহ যিনার অন্তরভুক্ত করেছেন এবং সে যিনার শাস্তি লাভের যোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম যুক্ফার (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেত (র) একে যিনা বলেন না এবং তাঁরা এ ধরনের কর্মে লিঙ্গ ব্যক্তির উপর “হদ” বা “তা’বীর” কোনটি জারি করার পক্ষপাতি নন। তা’বীর সম্পর্কে আমি আগোই বলে এসেছি যে, এর ফায়সালা করবেন কায়ী নিজেই অথবা রাষ্ট্রের মজলিসে সূরা প্রয়োজন বোধ করলে এ জন্য কোন উপযোগী ব্যবস্থা নিজেই প্রবর্তন করতে পারবে।

৩. এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে “আল্লাহর দীন” বলা হচ্ছে। এ থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র নামায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাতই

দীন নয় বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয় বরং আল্লাহর আইন ও শরীয়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও যেন অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। যেখানে একে নাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয় বরং আল্লাহর দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় যে জিনিসটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, আল্লাহর এ সতর্কবাণী : যিনাকরী ও যিনাকারিনীর উপর আমার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগকালে অপরাধীর জন্য দয়া ও যমতার প্রেরণা যেন তোমাদের হাত টেনে না ধরে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটি আরো স্পষ্টভাবে নিশ্চেষ্ট হাদীসটিতে বলেন :

يُؤْتَى بِوَالِنَّقْصَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطًا فَيُقَالُ لَهُ لَمْ فَعَلْتَ ذَاكَ؟ فَيَقُولُ رَحْمَةً
لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي؟ فَيُؤْمِرُهُ إِلَى النَّارِ - وَيُؤْتَى بِمَنْ
زَادَ سَوْطًا فَيُقَالُ لَهُ لَمْ فَعَلْتَ ذَاكَ؟ فَيَقُولُ لِيَنْتَهَا عَنْ مَعَاصِيكَ
فَيَقُولُ أَنْتَ أَحْكَمُ بِهِمْ مِنِّي؟ فَيُؤْمِرُهُ إِلَى النَّارِ -

“ কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে। সে হদের মধ্যে বেত্রাঘাতের সংখ্যা এক ঘা কমিয়ে দিয়েছিল। জিজেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে? জ্বাব দেবে, আপনার বাসাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে। আল্লাহ বলবেন : আচ্ছা, তাহলে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল ছিলে? তারপর হকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। আর একজন শাসককে আনা হবে। সে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ১টি বাড়িয়ে দিয়েছিল। জিজেস করা হবে, তুমি এ কাজ করেছিলে কেন? সে জ্বাব দেবে, যাতে লোকেরা আপনার নাফরামানি করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলবেন : আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে তুমি তাহলে আমার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ও বৃদ্ধিমান ছিলে? তারপর হকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)।

দয়া বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হদের মধ্যে কম-বেশী করার কাজ চললে এ অবস্থা হবে। কিন্তু কোথাও যদি অপরাধীদের মর্যাদার ভিত্তিতে বিধানের মধ্যে বৈষম্য করা হতে থাকে তাহলে সেটা হবে জঘন্য ধরনের অপরাধ। বুখারী ও মুসলিমে ইয়রত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত উন্মুক্ত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভাষণে বলেন : “হে লোকেরা! তোমাদের পূর্বে যেসব উচ্চত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এ জন্য ক্ষৎস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন মর্যাদাশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো।” অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “একটি হৃজারি করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার চাইতেও বেশী কল্পাণকর।” (নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থ গহণ করেছেন যে, অপরাধ প্রমাণ হবার পর অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া যাবে না এবং তার শাস্তিও কম করা যাবে না বরং তাকে পুরো একশ কোড়া মারতে হবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন যে, অপরাধী

الَّرَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالَّرَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَهُوَ أَذْلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③

ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিনী বা মুশারিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিনীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশারিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে না করে। আর এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে মু'মিনদের জন্য।^৫

যে মারের কোন কষ্ট অনুভব করতে না পারে এমন ধরনের কোন হাল্কা মার মারা যাবে না। আয়াতের শব্দাবলী উভয় ধরনের অর্থ সংলিপ্ত। বরং উভয় অর্থই প্রযোজ্য মনে হয়। বরঞ্চ সে সাথে এ অর্থও হয় যে, যিনাকারীকে সে শান্তি দিতে হবে যা আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাকে অন্য কোন শান্তিতে পরিবর্তিত করা যাবে না। কোড়া মারার পরিবর্তে যদি অন্য কোন শান্তি দেয়া ও মহত্তর ভিত্তিতে দেয়া হয়, তাহলে তা হবে গোনাহ। আর যদি কোড়া মারাকে একটি বর্বরাচিত শান্তি মনে করে অন্য শান্তি দেয়া হয়, তাহলে তা হবে নির্ভর কৃফরী, যা এক মুহূর্তকালের জন্যও ইমানের সাথে একই বক্ষে একত্র হতে পারে না। আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নেয়া আবার (নাউয়ুবিল্লাহ) তাকে বর্বরও বলা কেবলমাত্র এমন ধরনের লোকের পক্ষে সম্ভব যে জন্য পর্যায়ের মূলাফিক।

৪. অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শান্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। এ থেকে ইসলামের শান্তি তত্ত্বের উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। সূরা আল মা-য়েদায় চুরির শান্তি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছিল : جَزَاءً بِمَا كَسْبَنَا كَلَّا مِنَ اللَّهِ । " তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ প্রতিরোধক শান্তি।" (৩৮ আয়াত) আর এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যিনাকারীকে প্রকাশ্য লোকদের সামনে শান্তি দিতে হবে। এ থেকে জানা যায়, ইসলামী আইনে শান্তির তিনটি উদ্দেশ্য। এক, অপরাধী থেকে তার জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্থাদন করিয়ে দিতে হবে। দুই, তাকে পুনর্বার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিনি, তার শান্তিকে শিক্ষণীয় করতে হবে, যাতে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধিকারী অন্য লোকদের মগজ ধোলাই হয়ে যায় এবং তারা যেন এ ধরনের কোন অপরাধ করার সাহসই না করতে পারে। এ ছাড়াও প্রকাশ্যে শান্তি দেবার ক্ষেত্রে অহেতুক সুবিধা দান বা অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করার সাহস না দেখাতে পারে।

৫. অর্থাৎ অ-তাওবাকারী ব্যভিচারীর জন্য ব্যভিচারিনীই উপযোগী অথবা মুশারিক নারী। কোন সৎ মু'মিন নারীর জন্য সে মোটেই উপযোগী পুরুষ নয়। আর মু'মিনদের জন্য জেনে বুঝে নিজেদের মেয়েদেরকে এ ধরনের অসচারিত্ব লোকদের হাতে সোপর্দ করা হারাম। এভাবে যিনাকারিনী (অ-তাওবাকারী) মেয়েদের জন্য তাদেরই মতো যিনাকারীরা

অথবা মুশারিকরাই উপযোগী। সৎ মু'মিনদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু'মিনরা জানে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য হারাম। যে সমস্ত পুরুষ ও নারী তাদের চরিত্রহীনতার পথে গো ভাসিয়ে দিবেছে একমাত্র তাদের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর 'যিনাকারী' হবার দোষ আর তাদের জন্য প্রযুক্ত হয় না।

যিনাকারীর সাথে বিয়ে হারাম হবার অর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হাবল এ নিয়েছেন যে, আদতে তার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, এর অর্থ নিচেক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে আইনগতভাবে তা বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সঙ্গেও উভয় পক্ষকে যিনাকারী গণ্য করতে হবে একথা ঠিক নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে বলেন : "الحرام لا يحرم العدال" - "হারাম হাজারকে হারাম করে দেয় না।" (তাবারানী ও দারুলকুত্বানী) অর্থাৎ একটি বেআইনী কাজ অন্য একটি আইনসংগত কাজকে বেআইনী করে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তির যিনা করার কারণে সে যদি বিয়েও করে তাহলে তা তাকে যিনায় পরিণত করে দিতে পারে না এবং বিবাহ চূক্ষিক ঘূর্ণীয় পক্ষ যে ব্যক্তিকারী নয় সেও ব্যক্তিকারী গণ্য হবে না। নীতিগতভাবে বিদ্রোহ ছাড়া কোন অপরাধ এমন নেই, যা অপরাধ সম্পাদনকারীকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে (Outlaw) পরিণত করে। যার পরে তার আর কোন কাজই আইনসংগত হতে পারে না। এ বিষয়টি সামনে ত্রেখে যদি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-তাবনা করা যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য পরিকারভাবে এই মনে হয় যে, যাদের ব্যক্তিকারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত করা একটি শোনাহর কাজ। মু'মিনদের এ শোনাহ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তিকারীদের হিন্দত বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ শরীয়াত তাদেরকে সমাজের অবাস্থিত ও ঘৃণ্য জীব গণ্য করতে চায়।

অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও টানা যায় না যে, যিনাকারী মুসলিম পুরুষের বিয়ে মুশারিক নারীর সাথে এবং যিনাকারিনী মুসলিম নারীর বিয়ে মুশারিক পুরুষের সাথে সঠিক হবে। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যিনি একটি চরম নিকৃষ্ট কুর্ব। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজ করে সে মুসলিম সমাজের সৎ ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার নিজের মতো যিনাকারিনীদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত অথবা মুশারিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যারা আদৌ আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না।

এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদীস উদ্ভৃত হয়েছে সেগুলোই আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। মুসলাদে আহমাদ ও নাসাইতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রা) ব্রহ্ময়ায়াত উদ্ভৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উচ্চে মাহ্যাওল নামে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি অবস্থার করেছিল। এক মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চায় এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চায়। তিনি নিষেধ করে এ আয়াতটি পড়েন। তিরমিয়ী ও আবু দাউদে বলা হয়েছে, মারসাদ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءِ
فَاجْلِدُوهُنَّمِنْ بَعْدِ جَلْدِهِنَّ وَلَا تَقْبِلُوا الْهُمَشَادَةَ أَبْلَهُ أَوْلَئِكَ
هُمُ الْفَسِقُونَ ④ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর যারা সতী-সাক্ষী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ কথনে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং শুধরে যায়, অবশ্যই আগ্নাহ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।^৬

ইবনে আবি মারসাদ একজন সাহাযী ছিলেন। জাহেলী যুগে একাক ঈনাক নামক এক ব্যতিচারিনীর সাথে তার ঔবৈধ সম্পর্ক ছিল। পত্রে তিনি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন এবং রসূলগ্নাহ (সা) কাছে অনুমতি চান। দু'বার জিজ্ঞেস করার প্রয়োগে তিনি নীরব থাকেন। আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করেন, এবার তিনি জবাব দেন :

يامِرِثُ الزانِي لَا ينكحُ لَا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فَلَا تَنْكِحُهَا

“হে মারসাদ! ব্যতিচারী এক ব্যতিচারিনী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, কাজেই তাকে বিয়ে করো না।”

এ ছাড়াও হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হয়রত আমার ইবনে ইয়াসির (রা) খেকেও বিভিন্ন হাদীস উল্লিখ হয়েছে। সেগুলোতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “কোন দাইয়ুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে তার স্ত্রী ব্যতিচারিনী এবং এরপরও সে তার স্ত্রী থাকে) জানাতে প্রবেশ করতে পারে না।” (আহমাদ, নাসাই, আবু দাউদ) প্রথম দুই খ্লীফা হয়রত আবু বকর (রা) ও হয়রত উমর (রা) উভয়ই এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা ছিল এই যে, তাদের আমলে যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনি অভিযোগে ফ্রেক্ষত হতো তাদেরকে তাঁরা প্রথমে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন তারপর তাদেরকেই প্রস্তুরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি বড়ই পেরেশান অবস্থায় হয়রত আবু বকরের (রা) কাছে আসে। সে এমনভাবে কথা বলতে থাকে যেন তার মুখে কথা ভালভাবে ফুটছিল না। হয়রত আবু বকর (রা) হয়রত উমরকে (রা) বলেন, তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একাত্তে জিজ্ঞেস করুন ব্যাপারখানা কি? হয়রত উমর (রা) জিজ্ঞেস করতে সে বলে, তাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে এক ব্যক্তি এসেছিল। সে তার মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছে। হয়রত উমর (রা) বলেন : “قِبْحَكَ اللَّهُ، الْأَسْتَرَتْ عَلَى ابْنِكَ” তোমার মন্দ হোক, তুমি নিজের মেয়ের আবরণ ঢেকে দিলে না?” শেষ পর্যন্ত পুরুষটি ও মেয়েটির বিরুদ্ধে

মামলা চলে। উভয়কে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর উভয়কে পরস্পরের সাথে বিষে দিয়ে হয়েরত আবু বকর (রা) এক বছরের জন্য তাদেরকে দেশাভ্যর করেন। এ ধরনেরই আরো কয়েকটি ঘটনা কাফী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ৮৬, ২য় খণ্ড)।

৬. এ হকুমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজে লোকদের গোপন প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্কের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এর মাধ্যমে অসংখ্য অসৎকাজ, অসৎবৃত্তি ও অসৎ প্রবণতার প্রসার ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎবৃত্তি হলো, এভাবে সবার অলক্ষে একটি ব্যতিচারমূলক পরিবেশ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। একজন নিষ্ক কৌতুকের বশে কারোর সত্ত্ব বা মিথ্যা কৃৎসিত ঘটনাবলী অন্যের সামনে বর্ণণ করে বেড়ায়। অন্যেরা তাতে স্বব্ন মরিচ মাখিয়ে লোকদের সামনে পরিবেশন করতে থাকে এবং এ সহগে আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও নিজেদের বক্তব্য বা কুরুকারণ বর্ণনা করে। এভাবে কেবলমাত্র যৌবন কামনা-বাসনার একটি ব্যাপক ধারাই প্রবাহিত হয় না বরং খারাপ প্রবণতার অধিকারী নারী-পুরুষরা জানতে পারে যে, সমাজের কোথায় কোথায় অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারবে। শরীয়ত প্রথম পদক্ষেপেই এ জিনিসটির পথ রোধ করতে চায়। একদিকে সে হকুম দেয়, যদি কেউ যিনি করে এবং সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে তার যিনি প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে এমন চরম শাস্তি দাও যা অন্য কোন অপরাধে দেয়া হয় না। আবার অন্যদিকে সে ফায়সালা করে, যে ব্যক্তি অন্যের বিকল্পে যিনার অভিযোগ আনে সে সাক্ষ-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে তবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। ধরে নেয়া যাক যদি অভিযোগকারী কাটকে নিজের চেবে ব্যতিচার করতে দেখে তাহলেও তার নীরব থাকা উচিত এবং অন্যদের কাছে একথা না বলা উচিত ফলে য়লা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে যদি তার কাছে সাক্ষী থাকে তাহলে সমাজে আজ্ঞেবাজ্জে কথা ছড়াবার পরিবর্তে বিবর্যটি শাসকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং আদালতে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ আইনটি পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এর বিস্তারিত বিবর্যাবলী দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত। তাই আমি নীচে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি :

এক : আয়াতে **وَالْأَذْنَى بِمُؤْمِنٍ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয় “যেসব লোক অপবাদ দেয়।” কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বলে, এখানে অপবাদ মানে সব ধরনের অপবাদ নয় বরং বিশেষভাবে যিনার অপবাদ। প্রথমে যিনার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামনের দিকে আসছে **لِلْআন**-এর বিধান। এ দু’য়ের মাঝখানে এ বিধানটির আসা পরিকার ইংগিত দিচ্ছে এখানে অপবাদ বলতে কোনু ধরনের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। তারপর (অপবাদ দেয় সতী মেয়েদেরকে) থেকেও এ মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে এমন অপবাদের কথা বলা হয়েছে যা সতীত বিরোধী। তাছাড়া অপবাদদাতাদের কাছে তাদের অপবাদের প্রমাণস্বরূপ চারজন সাক্ষী আনার দাবী করা হয়েছে। সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থায় একমাত্র যিনার সাক্ষদাতাদের জন্য চারজনের

স্মর্ত্যা রাখা হয়েছে। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে সমগ্র উচ্চতরের আশেম সমাজের মতৈক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ আয়াতে শুধুমাত্র যিনার অপবাদের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য উলামায়ে কেরাম ব্রত্তে পারিভাষিক শব্দ “কায়াফ” নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে অন্যান্য অপবাদসমূহ (যেমন কাউকে ঢোর, শরাবী, সূদখোর বা কাফের বলা) এ বিধানের আওতায় এসে না পড়ে। “কায়াফ” ছাড়া অন্য অপবাদসমূহের শাস্তি কায়ী নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন অথবা দেশের মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের জন্য অপমান বা মানহানির কোন সাধারণ আইন তৈরী করতে পারেন।

দুই : يَرْمُونَ الْمُحْصِنَتْ (সতী নারীদেরকে অপবাদ দেয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধুমাত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া পর্যন্ত এ বিধানটি সীমাবদ্ধ নয় বরং নিষ্কল্প চরিত্রের অধিকারী পুরুষদেরকে অপবাদ দিলেও এ একই বিধান কার্যকর হবে। এভাবে যদিও অপবাদদাতাদের জন্য দ্বিতীয় শব্দ بِرْمُونَ الْذِينَ (যারা অপবাদ দেয়) পুরুষ নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তবুও এর মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই নির্দেশ করা হয়নি বরং মেয়েরাও যদি “কায়াফ”—এর অপরাধ করেন তাহলে তারাও এ একই বিধানের আওতায় শাস্তি পাবে। কারণ অপরাধের ব্যাপারে অপবাদদাতা ও যাকে অপবাদ দেয় তাদের পুরুষ বা নারী হলে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। কাজেই আইনের আকৃতি হবে এ রকম—যে কোন পুরুষ ও নারী কোন নিষ্কল্প চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর ওপর যিনার অপবাদ চাপিয়ে দেবে তার জন্য হবে এ আইন (উল্লেখ্য, এখানে “মুহসিন” ও “মুহসিনা” মানে বিবাহিত পুরুষ ও নারী নয় বরং নিষ্কল্প চরিত্র সম্পর্ক পুরুষ ও নারী)।

তিনি : অপবাদদাতা যখন কোন নিষ্কল্প চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে এ অপবাদ দেবে একমাত্র তথ্যই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কোন কলংকযুক্ত ও দাগী চারিত্র সম্পর্ক পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে এটি প্রযুক্ত হতে পারে না। দুচরিত্র বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে “অপবাদ” দেবার প্রগাই ওঠে না কিন্তু যদি সে এমন না হয়, তাহলে তার ওপর প্রমাণ ছাড়াই অপবাদদাতার জন্য কায়ী নিজেই শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন অথবা এ ধরনের অবস্থার জন্য মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রয়ন করতে পারে।

চার : কোন মিথ্যা অপবাদ (কায়াফ) দেয়ার কাজটি শাস্তিযোগ্য হবার জন্য শুধুমাত্র এতেকুই যথেষ্ট নয় যে, একজন অন্য জনের ওপর কোন প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার অপবাদ দিয়েছে। বরং এ জন্য কিছু শর্ত অপবাদদাতার মধ্যে, কিছু শর্ত যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে এবং কিছু শর্ত ব্যবহার কর্মের মধ্যে থাকা অপরিহার্য।

অপবাদদাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে মেণ্টলো হচ্ছে : প্রথমত তাকে প্রাঞ্চ বয়স্ক হতে হবে। শিশু যদি অপবাদ দেবার অপরাধ করে তাহলে তাকে আইন-শূল্যলা বিধানমূলক (তাঁয়ীর) শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ওপর শরিয়াতী শাস্তি (হদ) জারি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাকে মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। পাগলের ওপর “কায়াফের” শাস্তি জারি হতে পারে না। অনুরূপভাবে হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোন ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন ক্লোরোফরমের প্রভাবাধীন অপবাদদাতাকেও অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। তৃতীয়ত সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় (ফকীহগণের পরিভাষায় ‘তায়েআন’) এ কাজ

করবে। কারোর বল প্রয়োগে অপবাদদানকারীকে অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। চতুর্থত সে যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার নিজের বাপ বা দাদা নয়। কারণ তাদের ওপর অপবাদের হস্ত জারি হতে পারে না। এগুলো ছাড়া হানাফীদের মতে পঞ্চম আর একটি শর্তও আছে। সেটি হচ্ছে, সে বাকশভি সম্পর্ক হবে, বোবা হবে না। বোবা যদি ইশারা ইঁধনিতে অপবাদ দেয় তাহলে তার ফলে অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে না। ইমাম শাফেই এ থেকে ভিরমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি বোবার ইশারা একেবাইে সুস্পষ্ট ও ঘৃথহীন হয় এবং তা দেখে সে কি বলতে চায় তা লোকেরা বুঝতে পারে, তাহলে তো সে অপবাদদাতা। কারণ তার ইশারা এক ব্যক্তিকে লাহুত ও বদনাম করে দেবার ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করার তুলনায় কোন অংশে কম নয়। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে নিছক ইশারার মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ এত বেশী শক্তিশালী নয় যার ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে ৮০ ঘা বেত্রাধাতের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তারা তাকে শুধুমাত্র দমনমূলক (তা'য়ীর) শাস্তি দেবার পক্ষপাতি।

যাকে ব্যতিচারের অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যেও নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে। প্রথমত তাকে বুদ্ধি সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ তার ওপর এমন অবস্থায় যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় যখন সে বুদ্ধি সচেতন ছিল। পাগলের প্রতি (পরে সে বুদ্ধি সচেতন হয়ে গিয়ে থাক বা না থাক) যিনা করার অপবাদ দানকারী 'কায়াফ'-এর শাস্তিলাভের উপযুক্ত নয়। কারণ পাগল তার নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে পারে না। আর তার বিরলত্বে যিনা করার সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও সে যিনার শাস্তির উপযুক্ত হয় না এবং তার মর্যাদাও ক্ষুঁগ হয় না। কাজেই তার প্রতি অপবাদ দানকারীরও কায়াফের শাস্তিলাভের যোগ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাইস ইবনে সা'দ বলেন, পাগলের প্রতি ব্যতিচারের অপবাদদানকারী কায়াফের শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ সে একটি প্রমাণ বিহীন অপবাদ দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে প্রাণ বয়ঙ্ক হতে হবে। অর্থাৎ প্রাণ বয়ঙ্ক অবস্থায় তার ওপর যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। শিশুর বিরলত্বে অপবাদ দেয়া অথবা যুবকের বিরলত্বে এ মর্মে অপবাদ দেয়া যে, সে শৈশবে এ কাজ করেছিল, এ ধরনের অপবাদের ফলে 'কায়াফ'-এর শাস্তি ওয়াজিব হয় না। কারণ পাগলের মত শিশু নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে কায়াফ-এর শাস্তি তার ওপর ওয়াজিব হয় না এবং তার মান-সম্মানও নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম মালেক বলেন, যে ছেলে প্রাণ বয়ঙ্কের কাছাকাছি পৌছে গেছে তার বিরলত্বে যদি যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তো অপবাদদানকারীর ওপর কায়াফ-এর শাস্তি ওয়াজিব হবে না কিন্তু যদি একই বয়সের মেয়ের ওপর যিনা করাবার অভিযোগ আনা হয় যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, তাহলে তার প্রতি অপবাদদানকারী কায়াফ-এর শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র মেয়েরই নয় বরং তার পরিবারেরও মর্যাদা তুল্পিত হয় এবং মেয়ের তবিয়ত অঙ্ককার হয়ে যায়। ত্বরীয় পার্শ্ব হচ্ছে, তাকে মুসলিম হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম থাকা অবস্থায় তার বিরলত্বে যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। কাফেরের বিরলত্বে এ অপবাদ অথবা মুসলিমের বিরলত্বে এ অপবাদ যে, সে কাফের থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার জন্য কায়াফ-এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে। বাদি বা গোলামের বিরলত্বে এ অপবাদ অথবা স্বাধীনের বিরলত্বে এ অপবাদ যে, সে গোলাম থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার

জন্য কায়ফ-এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। কারণ গোলামীর অসহায়তা ও দুর্বলতার দরমন তার পক্ষে নিজের চারিত্রিক নিকলুষতার ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হতে পারে। ৩২ঃ কুরআনই গোলামীর অবস্থাকে ‘ইহুসান’ তথা পূর্ণ বিবাহিত অবস্থা গণ্য করেন। তাই সূরা নিসায় শব্দটি বাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দাউদ যাহুরী এ যুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, বাদি ও গোলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদদানকারীও কায়ফ-এর শাস্তিলাভের যোগ্য। পক্ষম শর্ত হচ্ছে, তাকে নিকলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তার জীবন যিনা ও যিনাসদৃশ চালচলন থেকে মুক্ত হবে। যিনা মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কখনো যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। যিনা সদৃশ থেকে মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, সে বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ, সন্দেহযুক্ত মালিকানা বা বিবাহ সদৃশ যৌন সংগম করেন। তার জীবন যাপন এমন ধরনের নয় যেখানে তার বিরুদ্ধে চরিত্রাত্মনভা ও নির্বজ্ঞ বেহায়াপননার অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং যিনার চেয়ে কম পর্যায়ে চরিত্রাত্মনভা অভিযোগ তার প্রতি ইতিপূর্বে কখনো প্রমাণিত হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রেই তার চারিত্রিক নিকলুষতা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় এবং এ ধরনের অনিচ্ছিত নিকলুষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী ৮০ ঘা বেত্রাধাতের শাস্তিলাভের যোগ্য হতে পারে না। এমন কি যদি ব্যক্তিচারের মিথ্যা অপবাদের (কায়ফ) শাস্তি জারি হবার আগে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে কখনো কোন যিনার অপরাধের সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ যার প্রতি সে অপবাদ আরোপ করেছিল সে নিকলুষ থাকেন।

কিন্তু এ পৌঁছটি ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি (হদ) জারি না হবার অর্থ এ নয় যে, পাগল, শিশু, কাফের, গোলাম বা অনিকলুষ ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ ছাড়াই যিনার অপবাদ আরোপকারী দমনমূলক (তা'রীয়) শাস্তিলাভের যোগ্যতা হবে না।

এবার ৩২ঃ মিথ্যা অপবাদ কর্মের মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া যেতে হবে সেগুলোর আলোচনায় আসা যাক। একটি অভিযোগকে দু'টি জিনিসের মধ্য থেকে কোন একটি জিনিস মিথ্যা অপবাদে পরিণত করতে পারে। এক, অভিযোগকারী অভিযুক্তের ওপর এমন ধরনের নারী সংগমের অপবাদ দিয়েছে যা সাক্ষের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিক ওপর যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। দুই, অথবা সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ সত্তান গণ্য করেন। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই এ অপবাদটি পরিকার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা-ইর্থগত গ্রহণযোগ্য নয়। এর সাহায্যে যিনা বা বংশের নিদার অর্থ গ্রহণ করা মিথ্যা অপবাদদাতার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল হয়। যেমন কাউকে ফাসেক, পাপী, ব্যক্তিচারী বা দুচরিত্রি ইত্যাদি বলে দেয়া অথবা কোন মেয়েকে বেশ্যা, কস্বী বা ছিনাপ বলা কিংবা কোন সৈয়দকে পাঠান বলে দেয়া—এসব ইশারা হয়। এগুলোর মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন মিথ্যা অপবাদ প্রমাণ হয় না। অনুরূপভাবে যেসব শব্দ নিছক গালাগালি হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন হারামি বা হারামজাদা ইত্যাদিকেও সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করা যেতে পারে না। তবে ‘তা'রীয়’ (নিজের প্রতি আপত্তিকর বক্তব্য অবীকৃতির মাধ্যমে অন্যকে বৌঁটা দেয়া) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে এটাও অপবাদ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যেমন কেউ অন্যকে সরোধন করে বলে, “হী, কিন্তু আমি তো আর যিনাকারী নই” অথবা “আমার মা তো আর যিনা করে আমাকে জন্ম দেয়নি।” ইমাম

মালেক বলেন, এমন কোন “তা’রীয়” “কায়াফ” বা যিনার মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে যা থেকে পরিকার বুঝা যায়, প্রতিপক্ষকে যিনাকারী বা জারজ সন্তান গণ্য করাই বক্তব্য। এ অবস্থায় “হদ” বা কায়াফ-এর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাব। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সাধীগণ এবং ইমাম শাফেই, সুফিয়ান সউরী, ইবনে উব্রুমাহ ও হাসান ইবনে সালেহ বলেন, “তা’রীয়ের” ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং সন্দেহ সহকারে কায়াফ-এর শাস্তি জারি হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাখওয়াইহ বলেন, যদি কাগড়া-বিবাদের মধ্যে “তা’রীয়” করা হয়, তাহলে তা হবে ব্যক্তিকারের মিথ্যা অপবাদ আর হাসি-ঠাটার মধ্যে করা হলে তা ব্যক্তিকারের মিথ্যা অপবাদ হবে না। খলীফাগণের মধ্যে হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) তা’রীয়ের জন্য কায়াফ-এর শাস্তি দেন। হযরত উমরের আমলে দু’জন লোকের মধ্যে গালিগালাজ হয়। একজন অন্য জনকে বলে, “আমার বাপও যিনাকারী ছিল না, আমার মাও যিনাকারিনী ছিল না।” মামলাটি হযরত উমরের দরবারে পেশ হয়। তিনি উপস্থিতি লোকদেরকে জিজেস করেন, আপনারা এ থেকে কি মনে করেন? কয়েকজন বলে, “সে নিজের বাপ-মার প্রশংসন করেছে। ধিতীয় ব্যক্তির বাপ-মা’র ওপর আক্রমণ করেনি।” আবার অন্য কয়েকজন বলে, “তাঁর নিজের বাপ-মা’র প্রশংসন করার জন্য কি শুধু এ শব্দগুলোই রয়ে গিয়েছিল? এ বিশেষ শব্দগুলোকে এ সময় ব্যবহার করার পরিকার অর্থ হচ্ছে, ধিতীয় ব্যক্তির বাপ-মা ব্যক্তিকারী ছিল।” হযরত উমর (রা) ধিতীয় দলটির সাথে একমত হন এবং ‘হদ’ জারি করেন। (জোস্সাস, ত৩৩ খণ্ড, ত৩৩০ পৃষ্ঠা) কারোর প্রতি সমকামিতার অপবাদ দেয়া ব্যক্তিকারের অপবাদ কিনা এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেই একে ব্যক্তিকারের অপবাদ গণ্য করেন এবং ‘হদ’ জারি করার হকুম দেন।

পৌঁচ : ব্যক্তিকারের মিথ্যা অপবাদ সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ (Cognizable Offence) কিনা এ ব্যাপারে ফর্কীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আবী লাইলা বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর হক। কাজেই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে সে দাবী করুক বা নাই করুক যিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কায়াফ-এর শাস্তি জারি করা ওয়াজিব। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালানো, যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে, তাঁর দাবীর ওপর নির্ভর করে এবং এটি ব্যক্তির হক। ইমাম শাফেই ও ইমাম আওয়াইও এ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে যদি শাসকের সামনে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তা হবে সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ অন্যথায় এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছে তাঁর দাবীর ওপর নির্ভরশীল।

ছয় : ব্যক্তিকারের মিথ্যা অপবাদ দেবার অপরাধ আপোসে মিটিয়ে ফেলার মতো অপরাধ (Compoundable Offence) নয়। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আদালতে মামলা দায়ের না করাটা তিনি ব্যাপার কিন্তু আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হবারপর অপবাদ দানকারীকে তাঁর অপবাদ প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে তাঁর ওপর ‘হদ’ জারি করা হবে। আদালত তাকে মাফ করতে পারে না, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও পারে না এবং কোন প্রকার অর্ধদণ্ড দিয়েও ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা

যেতে পারে না। তাওবা করে মাফ চেয়েও সে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি আগেই আগোচিত হয়েছে :

تَغْفِلُوا عَنِ الْحُنُودِ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغْنَى مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَجَبَ

“অপরাধকে আগোসে ঘটিয়ে দাও কিন্তু যে অপরাধের নালিশ আমার কাছে চলে এসেছে, সেটা ওয়াজিব হয়ে গেছে।”

সাত ৪ হানাফীদের মতে যিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবী করতে পারে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজেই অথবা যখন দাবী করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজে উপস্থিত নেই এমন অবস্থায় যার বংশের মর্যাদাহানি হয় সেও দাবী করতে পারে। যেমন বাপ, মা, ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়েরা এ দাবী করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেইস মতে এ অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভযোগ্য। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা গেলে তার প্রত্যেক শরণী উত্তরাধিকারী হৃদ জারি করার দাবী জানাতে পারে। তবে আচার্য ব্যাপার হচ্ছে, ইমাম শাফেইস্তু ও স্বামীকে এর বাইরে গণ্য করছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথেই দাস্পত্য সম্পর্ক খতম হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী কোন এক জনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে অন্যের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না। অর্থাৎ এ দু'টি যুক্তিই দুর্বল। কারণ শাস্তি দাবী করাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার বলে মেনে নেবার পর মৃত্যু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাস্পত্য সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে বলে স্বামী ও স্ত্রী এ অধিকারটি শাড় করবে না একথা বলা হ্যাঁ কুরআনের বক্তব্য বিব্রোধী। কারণ কুরআন এক জনের মরে যাওয়ার পর অন্যজনকে উত্তরাধিকারী গণ্য করেছে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন একজনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে অন্যজনের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না একথাটি স্বামীর ব্যাপারে সঠিক হলেও হতে পারে কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে একদম সঠিক নয়। কারণ যার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তার তো সমস্ত স্মৃতান স্মৃতির বংশধারাও সল্লেহযুক্ত হয়ে যায়। তাহাড়া শুধুমাত্র বংশের মর্যাদাহানির কারণে ব্যভিচারের যিথ্যা অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে, এ চিন্তাও সঠিক নয়। বংশের সাথে সাথে মান-সমান-ইচ্ছত-আবরন্ত বিরুদ্ধে প্রশংস্ত উত্থাপিত হওয়াও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সম্ভাস্ত পরিবারের একজন পুরুষ ও নারীর জন্য তার স্বামী বা স্ত্রীকে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী গণ্য করা কম মর্যাদাহানিকর নয়। কাজেই ব্যভিচারের যিথ্যা সাক্ষ দেবার দাবী যদি উত্তরাধিকারিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে তা থেকে আলাদা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আট : কোন ব্যক্তি ব্যভিচারের যিথ্যা অপবাদ দিয়েছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবার পর কেবলমাত্র নিম্নলিখিত জিনিসটিই তাকে শাস্তি থেকে বীচাতে পারে। তাকে এমন চারজন সাক্ষী আনতে হবে যারা আদালতে এ মর্যে সাক্ষ দেবে যে, তারা অপবাদ আরোপিত জনকে শুধু পুরুষ বা মেয়ের সাথে কার্যত যিনা করতে দেখেছে। হানাফীয়াদের মতে এ চারজন সাক্ষীকে একই সংগে আদালতে আসতে হবে এবং একই সংগে তাদের সাক্ষ দিতে হবে। কারণ যদি তারা একের পর এক আসে তাহলে তাদের প্রত্যেকে যিথ্যা অপবাদদাতা হয়ে যেতে থাকবে এবং তার জন্য আবার চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কিন্তু এটি একটি দুর্বল কথা। ইমাম শাফেইস ও উসমানুল বাস্তি এ ব্যাপারে যে

কথা বলেছেন সেটিই সঠিক। তারা বলেছেন, সাক্ষীদের একসঙ্গে বা একের পর এক আসার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বরং বেশী ভাল হয় যদি অন্যান্য মামলার মতো এ মামলায়ও সাক্ষীরা একের পর এক আসে এবং সাক্ষ দেয়। হানাফীয়াদের মতে এ সাক্ষীদের "আদেল" তথা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়। যদি অপবাদদাতা চারজন ফাসেক সাক্ষীও আনে তাহলে সে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও যিনার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ সাক্ষী "আদেল" নয়। তবে কাফের, অঙ্গ, গোলাম বা মিথ্যা অপবাদের অপরাধে পূর্বান্তে শাস্তিপ্রাপ্ত সাক্ষী পেশ করে অপবাদদাতা শাস্তি থেকে নিঃস্তি পেতে পারে না। কিন্তু ইমাম শাফেই বলেন, অপবাদদাতা যদি ফাসেক সাক্ষী পেশ করে, তাহলে সে এবং তার সাক্ষী সবাই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। ইমাম মালেকও একই রায় পেশ করেন। এ ব্যাপারে হানাফীয়াদের অভিমতই নির্ভুলতার বেশী নিকটবর্তী বলে মনে হয়। সাক্ষী যদি "আদেল" (ন্যায়নিষ্ঠ) হয় অপবাদদাতা অপবাদের অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু সাক্ষী যদি "আদেল" না হয়, তাহলে অপবাদদাতার অপবাদ, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যিনা ও সাক্ষীদের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচার সবই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকেও শরীয়াতের শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যেতে পারবে না।

নয় : যে ব্যক্তি এমন সাক্ষ পেশ করতে সক্ষম হবে না, যা তাকে অপবাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে তার ব্যাপারে কুরআন তিনটি নির্দেশ দেয় : এক, তাকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত করতে হবে। দুই, তার সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। তিন, সে ফাসেক হিসেবে তিহিত হবে। অতপর কুরআন বলছে :

اَلَّاَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

"তারা ছাড়া যারা এরপর তাওবা করে ও সংশোধন করে নেয়, কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (আন নূর-৫)

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে তাওবা ও সংশোধনের মাধ্যমে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক ঐ তিনটি নির্দেশের মধ্য থেকে কোনটির সাথে আছে? প্রথম হকুমটির সাথে এর সম্পর্ক নেই, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। অর্থাৎ তাওবার মাধ্যমে 'হ' তথা শরীয়াতের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে না এবং যে কোন অবহায়ই অপরাধীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। শেষ হকুমটির সাথে ক্ষমার সম্পর্ক আছে, এ ব্যাপারেও সকল ফকীহ একমত। অর্থাৎ তাওবা করার ও সংশোধিত হবার পর অপরাধী ফাসেক ধাকবে না। আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। (এ ব্যাপারে অপরাধী শুধুমাত্র মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়, না আদালতের ফায়সালা ঘোষিত হবার পর ফাসেক হিসেবে গণ্য হয়, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেই ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়। এ কারণে তাঁরা সে সময় থেকেই তাকে প্রত্যাখ্যাত সাক্ষী গণ্য করেন। বিপরীতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সহযোগীগুলি ও ইমাম মালেক বলেন, আদালতের ফায়সালা জারি হবার পর সে ফাসেক হয়। তাই তাঁরা হকুম জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য

হচ্ছে, অপরাধীর আঙ্গুহির কাছে ফাসেক হওয়ার ব্যাপারটি মিথ্যা অপবাদ দেবার ফল এবং তার মানুষের কাছে ফাসেক হওয়ার বিষয়টি আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এবং তার শাস্তি পাওয়ার শুরু নির্ভর করে।) এখন থেকে যায় মাঝখানের হকুমটি অর্থাৎ **”যিথ্যাং অপবাদাতার সাক্ষ কথনো গ্রহণ করা হবে না।“** । বাক্যাংশটির সম্পর্ক এ হকুমটির সাথে আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত ব্যাপকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলেন, কেবলমাত্র শেষ হকুমটির সাথে এ বাক্যাংশটির সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা ও সংশোধন করে নেবে সে আঙ্গুহির সমীক্ষে এবং মানুষের কাছেও ফাসেক থাকবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রথম দু'টি হকুম অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ অপরাধীর বিরুদ্ধে শরীয়তের শাস্তি জারি করা হবে এবং তার সাক্ষও চিরকাল প্রত্যাখ্যাত থাকবে। এ দলে রয়েছেন কায়ি শুরাইহু, সাইদ ইবনে মুসাইয়েব, সাইদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঞ্চ, ইবনে সিরীন, মাকহল, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুক্তি, মুহাম্মাদ, সুফিয়ান সউরী ও হাসান ইবনে সালেহের মতো শীর্ষ স্থানীয় ফকীহগণ। দ্বিতীয় দলটি বলেন, **”আন্দজিন্তাবু।“** এর সম্পর্ক প্রথম হকুমটির সাথে তো নেই-ই তবে শেষের দু'টো হকুমের সাথে আছে। অর্থাৎ তাওবার পর মিথ্যা অপবাদে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর সাক্ষও গ্রহণ করা হবে এবং সে ফাসেক হিসেবেও গণ্য হবে না। এ দলে রয়েছেন আতা, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম, যুহরী, ইকরামাহ, উমর ইবনুল আয়ায়, ইবনে আবী নুজাইহু, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, মাসরক, ঘাহাক, মালেক ইবনে আনাস, উসমান আলবাস্তী, লাইস ইবনে সা'দ, শাফেই, আহমাদ ইবনে হাবল ও ইবনে জারীর তাবারীর মতো শেষ ফকীহবৃন্দ। এরা নিজেদের মতের সমর্থনে অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের সাথে সাথে হযরত উমর রাদিয়াঙ্গাহ আনহ মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলায় যে ফায়সালা দিয়েছিলেন সেটিও পেশ করে থাকেন। কারণ তার কোন কোন বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, ‘হু’ জারি করার পর হযরত উমর (রা) আবু বাকরাহ ও তার দু' সাথীকে বলেন, যদি তোমরা তাওবা করে নাও (অথবা “নিজেদের মিথ্যাচারিতা শীকার করে নাও”) তাহলে আমি আগামীতে তোমাদের সাক্ষ গ্রহণ করে নেবো অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। সাথী দু'জন শীকার করে নেয় কিন্তু আবু বাকরাহ নিজের কথায় অন্ত থাকেন। বাহ্যত এটি একটি বড় শক্তিশালী সমর্থন মনে হয়। কিন্তু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণী আমি পূর্বেই পেশ করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এ নজিরের ভিত্তিতে এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা ঠিক নয়। সেখানে যুল কাজটি ছিল সর্ববাদী সম্ভত এবং ব্যং মুগীরাহ ইবনে শু'বাও এটি অবীকার করেননি। মেয়েটি কে ছিল, এ নিয়ে ছিল বিরোধ। মুগীরাহ (রা) বলছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী, যাকে এরা উষ্মে জামীল মনে করেছিলেন। এ সংগে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত মুগীরাহ স্ত্রী ও উষ্মে জামীলের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য ছিল যে, ঘটনাটি যে পরিমাণ আলোয় যতটা দূর থেকে দেখা গেছে তাতে মেয়েটিকে উষ্মে জামীল মনে করার মতো ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আব্দাজ-অনুমান সবকিছু ছিল মুগীরাহ পক্ষে এবং বাদীপক্ষের একজন সাক্ষীও একথা শীকার করেছিলেন যে, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। এ কারণে হযরত উমর (রা) মুগীরাহ ইবনে শু'বার পক্ষে রায় দেন এবং উপরে উল্লেখিত হাদীসে যে কথাগুলো উন্নত হয়েছে আবু বাকরাহকে শাস্তি দেবার পর

সেগুলো বলেন। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করলে পরিকার বুরা যাই, হয়রত উমরের উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা বুঝানো যে, তোমরা অথবা একটা কৃধারণা পোষণ করেছিলে, একথা মেনে নাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কৃধারণার ডিস্ট্রিভেন্স লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেবার উয়াদা কর। অন্যখ্যায় ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টোনা যেতে পারে না যে, সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত ব্যক্তিও যদি তাওবা করে তাহলে এরপর হয়রত উমরের মতে তার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। আসলে এ বিষয়ে প্রথম দলটির মতই বেশী শক্তিশালী মনে হয়। মানুষের তাওবার অবস্থা অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের সামনে যে ব্যক্তি তাওবা করবে আমরা তাকে বড় জোর ফাসেক বলবো না। এতটুকু সুবিধা তাকে আমরা দিতে পারি। কিন্তু যার মুখের কথার উপর আহা একবার খতম হয়ে গেছে সে কেবলমাত্র আমাদের সামনে তাওবা করছে বলে তার মুখের কথাকে আবার দাম দিতে থাকবো, এত বেশী সুবিধা তাকে দেয়া যেতে পারে না। এ ছাড়া কুরআনের আয়াতের বর্ণনাঙ্গীও একথাই বলছে—**أَلَّذِينَ تَابُوا**। (তবে যারা তাওবা করেছে) এর সম্পর্ক শুধুমাত্র আল্লাহ ফাসেকে এর সাথেই রয়েছে। তাই এ বাক্যের মধ্যে প্রথম দু'টি কথা বলা হয়েছে কেবলমাত্র নির্দেশমূলক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ “তাদেরকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো।”, “এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না।” আর তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে খবর পরিবেশন করার ভঙ্গীতে। অর্থাৎ “তারা নিজেরাই ফাসেক।” এ তৃতীয় কথাটির পরে সাথে সাথেই “তারা ছাড়া যারা তাওবা করে নিয়েছে” একথা বলা প্রকাশ করে দেয় যে, এ ব্যক্তিক্রমের ব্যাপারটি শেষের খবর পরিবেশন সংক্রান্ত বাক্যাংশটির সাথে সম্পর্কিত। পূর্বের দু'টি নির্দেশমূলক বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। তবুও যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, এ ব্যক্তিক্রমের ব্যাপারটি শেষ বাক্যাংশ পর্যন্ত এসে যেমে গেল কেন, “আশি ঘা বেত্রাঘাত করো” বাক্যাংশ পর্যন্ত পৌছে গেল না কেন?

দশ : প্রশ্ন করা যেতে পারে, **أَلَّذِينَ تَابُوا** এর মাধ্যমে ব্যক্তিক্রম করাটাকে প্রথম হকুমটির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া যায় না কেন? মিথ্যা অপবাদ তো আসলে এক ধরনের মানহানিই। এরপর এক ব্যক্তি নিজের দোষ মেনে নিয়েছে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাছ করবে না বলে তাওবা করেছে। তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না কেন? অথচ আল্লাহ নিজেই হকুম বর্ণনা করার পর বলছেন, **فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ... **أَلَّذِينَ تَابُوا**। আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু বাস্তু মাফ করবে না, এটাতো সভাই বড় অস্তুত ব্যাপার হবে। এর জবাব হচ্ছে : তাওবা আসলে ০ - ১ - ২ - ৩ সমর্বিত চার অক্টোবের একটি শব্দ মাত্র নয়। বরং স্তদয়ের লজ্জান্তৃতি, সংশোধনের দৃঢ়সংকলন ও সততার দিকে ফিরে যাওয়ার নাম। আর এ জিনিসটির অবস্থা আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই তাওবার কারণে পার্থিব শান্তি মাফ হয় না। বরং শুধুমাত্র পরকালীন শান্তি মাফ হয়। এ কারণে আল্লাহ বলেননি, যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও বরং বলেছেন, যারা তাওবা করে নেবে আমি তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করণ্যামূল। যদি তাওবার সাহায্যে পার্থিব শান্তি মাফ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে শান্তি থেকে বীচার জন্য তাওবা করবে না এমন অপরাধী কে আছে?

এগার : এ প্রশ্নও করা যেতে পারে, এক ব্যক্তির নিজের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে না পারার মানে তো এ নয় যে, সে মিথ্যক। এটা কি সম্ভব নয় যে, তার অভিযোগ যথাথৰই সঠিক কিন্তু সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ সঞ্চাহ করতে পারেনি? তাহলে শুধুমাত্র প্রমাণ পেশ করতে না পারার কারণে তাকে কেবল মানুষের সামনেই নয়, আল্লাহর সামনেও ফাসেক গণ্য করা হবে, এর কারণ কি? এর জবাব হচ্ছে, এক ব্যক্তি নিজের চেষ্টেও যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও সে তা নিয়ে আলোচনা করলে এবং সাক্ষী ছাড়া তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে থাকলে গোনাহগার হবে। এক ব্যক্তি যদি কোন ময়লা আবর্জনা নিয়ে এক কোণে বসে থাকে তাহলে অন্য ব্যক্তি উঠে সমস্ত সমাজ দেহে তা ছড়িয়ে বেড়াক আল্লাহর শরীয়াত এটা চায় না। সে যদি এ ময়লা-আবর্জনার খবর জেনে থাকে তাহলে তার জন্য দু'টি পথ থাকে। যেখানে তা পড়ে আছে সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেবে অথবা তার উপস্থিতির প্রমাণ পেশ করবে, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ তা পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। এ দু'টি পথ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ তার জন্য নেই। যদি সে জনগণের মধ্যে এর আলোচনা শুরু করে দেয় তাহলে এক জ্ঞানপায় আটকে থাকা আবর্জনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। আর যদি সে যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ ছাড়াই বিষয়টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে নিয়ে যায় তাহলে শাসকগণ তা পরিষ্কার করতে পারবেন না। ফলে এ মামলায় ব্যর্থতা আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ার কারণও হবে এবং ব্যভিচারীদের মনে তা সাহসের সংঘরণও করবে। এ জন্য সাক্ষ-প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অভিযোগকারী বাস্তবে যতই সত্যবাদী হোক না কেন সে একজন ফাসেকই।

বার : মিথ্যা অপবাদের 'ইদে'র ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, অপবাদাদাতাকে যিনাকারীর তুলনায় হালকা মার মারতে হবে। অর্থাৎ ৮০ ঘা বেতই মারা হবে কিন্তু যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে প্রহার করা হয় তাকে ঠিক ততটা কঠোরভাবে প্রহার করা হবে না। কারণ যে অভিযোগের দরুন তাকে শান্তি দেয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে তার মিথ্যাবাদী হওয়াটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

তের : মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তির ক্যাপারে হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হচ্ছে এই যে, অপবাদাদাতা শান্তি পাবার আগে বা মাঝখানে যতবারই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করুক না কেন 'ইদ' তার ওপর একবারই জারি হবে। আর যদি হদ জারি করার পর সে নিজের পূর্ববর্তী অপরাধেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তাহলে যে 'ইদ' তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট হবে। তবে যদি হদ জারি করার পর সে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন কোন যিনার অপবাদ দেয় তাহলে আবার নতুন করে মামলা দায়ের করা হবে। মুগীরাহ ইবনে শ'বার (রা) মামলায় শান্তি পাবার পর আবু বাক্রাহ প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, "আমি সাক্ষ দিছি, মুগীরাহ যিনা করেছিল।" হ্যরত উমর (রা) আবার তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সংকল্প করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আগের অপবাদেরই পুনরাবৃত্তি করছিলেন, তাই হ্যরত আলী (রা) তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা ঢালানো যেতে পারে না বলে রায় দেন। হ্যরত উমর তাঁর রায় গ্রহণ করেন। এরপর ফকীহগণ ঐকমত্যে পৌছেন যে, শান্তিপ্রাপ্ত মিথ্যা অপবাদাদাতাকে কেবলমাত্র নতুন অপবাদেই পাকড়াও করা যেতে পারে, আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তিতে নয়।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
 فَشَهَادَةُ أَحَدٍ هُمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِإِلَهِهِ «إِنَّهُ لِمَنَ الصِّدِّيقِينَ»
 وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ^১ وَيَدْرُؤُ
 عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِإِلَهِهِ «إِنَّهُ لِمَنَ الْكُفَّارِ»^২
 وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ^৩ وَلَوْلَا فَضْلُ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَاتُ حَكِيمٌ^৪

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর বিভীষ কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ হচ্ছে (এই যে, সে) চার বার আল্লাহর নামে কসম থেয�ে সাক্ষ দেবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর না'ন্ত হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রাখিত হতে পারে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম থেয়ে সাক্ষ দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর আল্লাহর গ্যব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।^১ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ বড়ই মনোযোগ দানকারী ও জ্ঞানী না হলে (স্ত্রীদের প্রতি অভিযোগের ব্যাপার তোমাদেরকে বড়ই জটিলতার সম্মুখীন করতে)।

চৌদঃ : কোন দল বা গোষ্ঠীর ওপর মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাসীরা বলেন, যদি এক ব্যক্তি বহু লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, যদিও তা একটি শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে হয়, তাহলেও তার ওপর একটি 'হ্দ' জারি করা হবে। তবে যদি 'হ্দ' জারির পর সে আবার কোন নতুন মিথ্যা অপবাদের অবতারণা করে তাহলে সে জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কারণ আয়াতের শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে : 'যারা সতী সাক্ষী মেয়েদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।' এ থেকে জানা যায়, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নয়, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীও শুধুমাত্র একটি 'হ্দের' হকদার হয়। এ ব্যাপারে আরো একটি যুক্তি এই যে, যিনার এমন কোন অপবাদই হতে পারে না যা কমপক্ষে দু'ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়াত প্রবর্তক একটি 'হ্দেরই হকুম দিয়েছেন। নারীর বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা

এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা 'হন' জারি করার হকুম দেননি। এর বিপরীতে ইমাম শাফেই বলেন, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ দানকারী, এক শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে অপবাদ দান কর্মক না কেন, সে জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাবে এক একটি পূর্ণ 'হন' জারি করা হবে। উসমান আলবাজীও এ অভিমত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে ইবনে আবিলাইলার উক্তি, শা'বী ও আওয়াইও যার সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন তা হচ্ছে এই যে, একটি বিবৃতির মাধ্যমে পুরো দলের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী একটি হদের ইফদার হবে এবং আলাদা আলাদা বিবৃতির মাধ্যমে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী প্রত্যেকটি অপবাদের জন্য আলাদা আলাদা হদের অধিকারী হবে।

৭. এ আয়াত পেছনের আয়াতের কিছুকাল পরে নাফিল হয়। মিথ্যা অপবাদের বিধান যখন নাফিল হয় তখন গোকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তিনি পুরুষ ও নারীর চরিত্রান্তা দেখে তো মানুষ সবর করতে পারে, সাক্ষী না থাকলে ঠোটে তালা লাগাতে পারে এবং ঘটনাটি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু নিজের স্তুর চরিত্রান্তা দেখলে কি করবে? হত্যা করলেতো উন্টে শাস্তিলাভের ঘোগ্য হয়ে যাবে। সাক্ষী খুঁজতে গেলে তাদের আসা পর্যন্ত অপরাধী সেখানে অপেক্ষা করতে যাবে কেন? আর সবর করলে তা করবেই বা কেমন করে। তালাক দিয়ে স্তুকে বিদায় করে দিতে পারে। কিন্তু এর ফলে না মেয়েটির কোন বস্তুগত বা নৈতিক শাস্তি হলো, না তার প্রেমিকের। আর যদি তার অবৈধ গর্তসন্ধার হয়, তাহলে অন্যের স্তুন নিজের গলায় ঝুললো। এ প্রশ্নটি প্রথমে হ্যারত সা'দ ইবনে উবাদাহ একটি কাজনিক প্রশ্নের আকারে পেশ করেন। তিনি এতদূর বলে দেন, আমি যদি আল্লাহ না কর্তৃ নিজের ঘরে এ অবস্থা দেখি, তাহলে সাক্ষীর সন্ধানে যাবো না বরং তলোয়ারের মাধ্যমে তখনই এর হেতুনেতু করে ফেলবো। (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু যাত্র কিছুদিন পরেই এমন কিছু যামলা দায়ের হলো যেখানে স্বামীরা ব্যচক্ষেই এ ব্যাপার দেখলো এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ নিয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমরের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আনসারদের এক ব্যক্তি (সম্ভবত উওয়াইমির আজ্লানী) রসূলের সামনে হাথির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি এক ব্যক্তি নিজের স্তুর সাথে পরপুরূষকে পায় এবং সে মুখ থেকে সে কথা বের করে ফেলে, তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের 'হন' জারি করবেন, হত্যা করলে আপনি তাকে হত্যা করবেন, নীরব থাকলে সে চাপা ক্রোধে ফুস্তে থাকবে। শেষমেশ সে করবে কি? একথায় রসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেন : হে আল্লাহ! এ বিষয়টির ফায়সালা করে দাও। (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ, আহমাদ ও নাসাই) ইবনে আব্রাস বর্ণনা করেন, "প্রমাণ আনো, অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি জারি হবে।" এতে সাহাবীদের মধ্যে সাধারণভাবে পেরেশানী সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হেলাল বলেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি একদম সঠিক ঘটনাই তুলে ধরছি, আমার চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং কান শুনেছে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার ব্যাপারে এমন হকুম নাফিল করবেন যা আমার পিঠ বাঁচাবে। এ ঘটনায় এ আয়াত

নাখিল হয়। (বুখারী, আহমাদ ও আবু দাউদ) এখানে মীমাংসার যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছে তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় “লি’আন” বলা হয়।

এ হকুম এসে যাবার পর নবী সাল্লাহুার আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব মামলার ফায়সালা দেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিভাবগুলোতে শিখিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেগুলোই লি’আন সংজ্ঞাত বিস্তারিত আইনগত কার্যধারার উৎস।

হেলাল ইবনে উমাইয়ার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ সিহাহে সিন্তা ও মুসনাদে আহমাদ এবং তাফসীরে ইবনে জারিয়ে ইবনে আবাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিমাল্লাহ আনহমা থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে : এ আয়াত নাখিল হবার পর হেলাল ও তার স্তৰী দু’জনকে নবীর আদালতে হায়ির করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে আল্লাহর হকুম শুনান। তারপর বলেন, “খুব ভালভাবে বুঝে নাও, আবেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চাইতে কঠিন।” হেলাল বলেন, “আমি এর বিরুদ্ধে একদম সত্য অভিযোগ দিয়েছি।” স্তৰী বলে, “এ সম্পূর্ণ মিথ্যা।” রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “বেশ, তাহলে এদের দু’জনের মধ্যে লি’আন করানো হোক।” তদন্তস্বরে প্রথমে হেলাল উঠে দৌড়ান। তিনি কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কসম খাওয়া শুরু করেন। এ সময় নবী সাল্লাহুার আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বলতে থাকেন, “আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যেবাদী। তারপর কি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাওবা করবে?” পঞ্চম কসমের পূর্বে উপস্থিত শোকেরা হেলালকে বললো, “আল্লাহকে তয় করো। দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে হালকা। এ পঞ্চম কসম তোমার ওপর শাস্তি শুয়াজিব করে দেবে।” কিন্তু হেলাল বলেন, যে আল্লাহ এখানে আমার পিঠ বাঁচিয়েছেন তিনি পরকালেও আমাকে শাস্তি দেবেন না। একথা বলে তিনি পঞ্চম কসমও খান। তারপর তার স্তৰী উঠে। সেও কসম থেকে শুরু করে। পঞ্চম কসমের পূর্বে তাকেও ধারিয়ে বলা হয়, “আল্লাহকে তয় করো, আবেরাতের আয়াবের তুলনায় দুনিয়ার আয়াব বরদাশৃত করে নেয়া সহজ। এ শেষ কসমটি তোমার ওপর আল্লাহর আয়াব ওয়াজিব করে দেবে।” একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে যায় এবং ইত্তেজত করতে থাকে। শোকেরা মনে করে নিজের অপরাধ বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারপর সে বলতে ‘থাকে, “আমি চিরকালের জন্য নিজের গোত্রকে শাস্তি করবো না।” তারপর সে পঞ্চম কসমটিও খায়। অতপর নবী সাল্লাহুার আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা দেন, এর স্তান (যে তখন মাত্রগতে ছিল) মায়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। বাপের সাথে সম্পর্কিত করে তার নাম ডাকা হবে না। তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবার অধিকার কারোর থাকবে না। যে ব্যক্তি তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবে সে মিথ্যা অপবাদের (কায়ফ) শাস্তির অধিকারী হবে। ইন্দিকালে তার খোরগোশ ও বাসহানলাভের কোন অধিকার হেলালের ওপর বর্তায় না। কারণ তাকে তালাক বা মৃত্যু ছাড়াই স্বামী থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তারপর তিনি শোকদের বলেন, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখো সে কার মতো হয়েছে। যদি এ আকৃতির হয় তাহলে হেলালের হবে। আর যদি ঐ আকৃতির হয়, তাহলে যে ব্যক্তির সাথে মিলিয়ে একে অপবাদ দেয়া হয়েছে এ তার হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেলো সে শেষেক্ষণ ব্যক্তির আকৃতি পেয়েছে। এ অবস্থায় নবী সাল্লাহুার আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, লকান لى ولهَا شان (لولا مضى من كتاب الله لوا لا إيمان

অর্থাৎ যদি কসমসমূহ না হতো (অথবা আগ্নাহৰ কিতাব প্রথমেই ফায়সালা না করে দিতো) তাহলে আমি এ মেয়েটির সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম।

উওয়াইমির আজলানীর মামলার বিবরণ পাওয়া যায় বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে। সাহল ইবনে সা'দ সা'ঈদী ও ইবনে উমর রাদিয়াগ্নাহ আনহমা থেকে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : উওয়াইমির ও তার স্ত্রী উত্তরকে মসজিদে নববীতে ডাকা হয়। তারা নিজেদের ওপর ‘লি’আন’ করার আগে রসূলগ্নাহ (সা) তাদেরকেও সতর্ক করে দিয়ে তিনবার বলেন, “আগ্নাহ খুব ভালভাবেই জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাহলে কি তোমাদের কেউ তাওবা করবে?” দু’জনের কেউ যখন তাওবা করলো না তখন তাদের ‘লি’আন’ করানো হয়। এরপর উওয়াইমির বলেন, “হে আগ্নাহৰ রসূল। যদি আমি এ স্ত্রীকে রেখে দেই তাহলে মিথ্যক হবো।” একথা বলেই রসূলগ্নাহ (সা) তাকে হকুম দেয়া ছাড়াই তিনি তিন তালাক দিয়ে দেন। সাহল ইবনে সা'দ বলেন, রসূলগ্নাহ (সা) এ তালাক জারি করেন, তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং বলেন, “যে দম্পতি লি’আন করবে তাদের জন্য এ ছাড়াছাড়ি।” লি’আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার এ সুন্নাত কায়েম হয়ে যায়। এরপর তারা আর কখনো একত্র হতে পারবে না। সাহল ইবনে সা'দ একথাও বর্ণনা করেন যে, স্ত্রী গর্ভবতী ছিল এবং ‘উওয়াইমির বলেন, এ গর্ভ আমার প্রিয়সজাত নয়। এ জন্য শিশুকে মায়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয় এবং এ সুন্নাত জারি হয় যে, এ ধরনের সন্তান মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে।

এ দু’টি মামলা ছাড়া হাদীসের কিতাবগুলোতে আমরা এমন বহু রেওয়ায়াত পাই যেগুলো থেকে এ মামলাগুলো কাদের সাথে জড়িত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। হতে পারে সেগুলোর কোন কোনটি এ দু’টি মামলার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কয়েকটিতে অন্য কিছু মামলার কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে লি’আন আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত হয়।

ইবনে উমর একটি মামলার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রী লি’আন শেষ করার পর নবী সাগ্নাগ্নাহ আলাইহি ওয়া সালাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, আহমাদ ও ইবনে জারীর) ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি’আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অধীকার করে। নবী সাগ্নাগ্নাহ আলাইহি ওয়া সালাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। (সিহাহে সিন্তা ও আহমাদ) ইবনে উমরেরই আর একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, উত্তরের লি’আন করার পরে রসূলগ্নাহ (সা) বলেন, “তোমাদের হিসাব এখন আগ্নাহৰ জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যক।” তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, *لَا سبِيل للك علىها* (অর্থাৎ এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর ওপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিশোধ্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই।) পুরুষটি বলে, হে আগ্নাহৰ রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবহা করুন)। রসূলগ্নাহ (সা) বলেন :

لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا إِسْتَحْكَمْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ
كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا -

“সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার ওপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে এই সম্পদ মে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হাস্তান করে তার থেকে শাশ্বত করেছো। আর যদি তুমি তার ওপর যিখ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।” (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

দারুকৃত্নী আলী ইবনে আবু তালেব ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহমার উক্তি উচ্চৃত করেছে। তাতে বলা হয়েছে : “সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি’আনকারী স্বামী-স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো একত্র হতে পারে না।” (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আর কোনদিন তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।) আবার এ দারুকৃত্নী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা দু’জন আর কখনো একত্র হতে পারে না।

কাবীসাহ ইবনে যুওয়াইব বর্ণনা করেছেন, হযরত উমরের আমলে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অবৈধ গণ্য করে তারপর আবার তা নিজের বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বলতে থাকে, এ শিশু আমার নয়। ব্যাপারটি হযরত উমরের আদালতে পেশ হয়। তিনি তার ওপর কায়ফের শাস্তি জারি করেন এবং ফায়সালা দেন, শিশু তার সাথেই সম্পর্কিত হবে। (দারুকৃত্নী, বাইহাকী)।

ইবনে আব্রাস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হায়ির হয়ে বলে, আমার একটি স্ত্রী আছে, আমি তাকে ভীষণ ভাঙবাসি। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে কোন স্পর্শকারীর হাত ঠেলে দেয় না। (উল্লেখ্য, এটি একটি রূপক ছিল। এর অর্থ যিনাও হতে পারে আবার যিনার কম পর্যায়ের নৈতিক দুর্বলতাও হতে পারে।) নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তালাক দিয়ে দাও। সে বলে, আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারি না। জবাব দেন, তুমি তাকে রেখে দাও। (অর্থাৎ তিনি তার কাছ থেকে তার ইঁথগিতের ব্যাখ্যা নেননি এবং তার উক্তিকে যিনার অপবাদ হিসেবে গণ্য করে লি’আন করার হুকুম দেননি।)-নাসাই।

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি হায়ির হয়ে বলে, আমার স্ত্রী কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। আমি তাকে আমার সন্তান বলে মনে করি না। (অর্থাৎ নিছক শিশু সন্তানের গায়ের রং তাকে সন্দেহের মধ্যে নিষ্কেপ করেছিল। নয়তো তার দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ শাগাবার অন্য কোন কারণ ছিল না।) রসুলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার তো কিছু উট আছে? সে বলে, হী, আছে। জিজ্ঞেস করেন, সেগুলোর রং কি? জবাব দেয়, লাল। জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনটা কি খাকি রংয়ের আছে? জবাব দেয়, জি হী, কোন কোনটা এমনও আছে। জিজ্ঞেস করেন, এ রংটি কোথায় থেকে এলো? জবাব দেয়, ইয়তো কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদাদের কেউ এ রংয়ের থেকে থাকবে এবং তার প্রভাব এর মধ্যে এসে গেছে।) তিনি বলেন, “সম্ভবত এ শিশুটিকেও কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে।” তারপর তিনি তাকে সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার অনুমতি দেননি। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ।)

আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লাম লি'আন সম্পর্কিত আয়াত আলোচনা প্রসংগে বলেন, “যে স্ত্রী কোন বৎশে এমন সন্তান প্রবেশ করায় যে এই বৎশের নয় (অর্থাৎ হারামের শিশু গভে ধারণ করে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়) তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কব্যখনো জানাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পূর্ণ নিজের সন্তানের বৎশধারা অধিকার করে অথচ সন্তান তাকে দেখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে পরদা করবেন এবং পূর্বের ও পরের সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাকে লাষ্টিত করবেন। (আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী।)

লি'আনের আয়াত এবং এ হাদীসগুলো, নজিরসমূহ ও শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি-গুলোই হচ্ছে ইসলামে লি'আনের আইনের উৎস। এগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি'আনের বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছে :

এক : যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যতিচার স্বচক্ষে দেখে লি'আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে ‘হন’ জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহয়ওয়াইহু বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে। যালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে। (নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা।)

দুই : ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী।

তিনি : লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার ওপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বৎশধারা মেনে নিতে অঙ্গীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে।

চার : সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেত বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি'আন করতে পারে। অর্থাৎ তার মতে শুধুমাত্র মানসিকভাবে সৃষ্ট ও প্রাণ্ত বয়স্ক হওয়াই লি'আনের যোগ্যতা সম্পর্ক হবার জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী মুসলিম বা দাফের, গোলাম বা স্বামীন, ধরণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী হোক বা না হোক এবং মুসলিম স্বামীর স্ত্রী মুসলমান বা যিদী যেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। প্রায় একই ধরনের অতিমত ইমাম যালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ

ବିଜେନ, ନିଯାମ ଓ ହୃଦୟ ଏଥିଲା କୁଣ୍ଡଳାନ ବ୍ୟାକ୍‌ପ୍ରାତି ମହୋ ହତେ ପାଞ୍ଜଳ ଶରୀର
ବାଧାରେ ଅଶ୍ରାଦ୍ୟ ଥାବି ପାତି ପାତିନି, ସଦି ଶରୀର ଓ ଶୈଳୀ ଦୂରାନ୍ତର କାହିଁରେ, କାନ୍ଦାମ ବା କାନ୍ଦାରେ
ବନ୍ଦାରେ ପୂର୍ବରେ ଶାତି ଥାତ ହେଁ ଏବେ, ତାହିଁଲେ ଭାଦରେ ମହୋ ନିଯାମ ହତେ ପାତି ନା ଏ
ହତ୍ତାତ ସଦି ପ୍ରାତି ଏହି ମାତ୍ରେ କରିଲା ହୀରାମ ବା ସନ୍ଦେହ୍ୟୁକ୍ତ ପରିଭିତେ କୋଣ ଶୁଣୁଟିର ମାତ୍ରେ
ଶାତାମାତି କରେ ଥାଦେ, ତାହିଁଲେ ଏ କେତେତେ ନିଯାମ ଟିକୁ ହେଁ ହେଁ ନା, ହୀରାମକୁଳର ଏ
ପରିଭିତୋ - ଜ୍ଞାନ କରାର କାରଣ ହେଁ, ଏହି କେ, ଭାଦରେ ମହୋ ନିଯାମ ଓ କାନ୍ଦାରେ ଏହିଲେ
ମହୋ ଏ ଏହା ଆର କୋଣ ପାରିବା ନେଇ ଯେ, ନା ସାତି ସଦି ସାତିଭାବେ ଶିଖ୍ୟା ଅଧିକାନ ନେଇ
ଭାବିବେ। ତାର କାଳ ଗୋଟିଏ, ଏହି ଆର ଶରୀର ଏ ଅପବାଦ ଦିନେ ମେ ନିଯାମର କରେ ପରାହତି
ଏବଂ କରତେ ଥାଦେ ବାବି ଧନ୍ୟାନ୍ୟ ମର ଦିକ୍ ଦିକ୍ଷେ ନିଯାମ ଓ କାନ୍ଦାରେ ଏହି ନିଯିମ ଏ
ହତ୍ତାତ ହାନ୍ତାମନ୍ଦରେ ମହୋ ଯେହେତୁ ନିଯାମର କମ୍ପ ସାକ୍ ଦେବର ଶରୀର ହାତେ, ତାହିଁ ମାତ୍ର
ଦେବର ମୋହାରୀ ନେଇ ଏଥିଲା କୁଣ୍ଡଳକେ ଭାବୀ ଏର ଅନୁଭିତି ଦେଇ ନା ବିନ୍ଦୁ ପୃଷ୍ଠାତରେ ଏ
ବାଧାରେ ହାନ୍ତାମନ୍ଦରେ ଅଭିମତ ଦୂରିନ ଏବଂ ହୀରାମ ଶାତରେ ଯେ କରିବି କରିଲେ ଶୈଳୀ
ମହିତି, ଏଇ ଅଧେ କରିବି ହେଁ, କୁଣ୍ଡଳ ଦୂରିର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଧାରେ ବାପାରତିକିର କାରାଯିବେ
ଏହିଲେର ଏକଟି ଧରେ ପରିଷିକ୍ଷା କରିଲି ଏବଂ ମେ ନା ଏକଟି ବାତା ଏହିଲା କରିଲା ଏହିଲେ
ତାହିଁ ତାକେ ବାଧାରେ ବାହିନେର ଅଭିମତ ଏହି କାରା ଉଚିତ, ବାଧାରେ ଏହିଲା କରିଲା ନା, ମେହି
ମେହି କାରାଯିବେ ଶାତାତେ ଥାବି ନେଇ ଏହି ଏଥିଲା ନୋକ ଯେ ମତି ଶାତି ନାହିଁର ଅପବାଦ
ଶିଖ୍ୟା ଅପବାଦ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ନିଯାମର ଅଭିମତ ମତି ଶାତି ପ୍ରାତି ଏହି ବାପାର କରି ହୁବି
ଏହି ମେହି କୋଣ ମହୋ ହୀରାମ ପାପ କାହିଁକି କରିଲି, ସଦି ପରିବାରକାଳେ ମେ ଭାତ୍ତା ହେଁ
କୋଣ ଶୁଣୁଟିକେ ବିଯେ କରେ ଏବଂ ତାରପର ଭାବ ହୀରାମ କରିଲେ ଶିଖ୍ୟା ଅଧିକାନ ନେଁ,
ତାହିଁଲେ ନିଯାମର ଆଜିତ ଏକବାବ ବଲେ ନା ଯେ, ଏ ମେହି ଶାତିକେ ଏର ବିଶିଷ୍ଟ ଅପବାଦ
ଦେବରେ ଏ ଏକ ମହା କୁଣ୍ଡଳ ଏଥିଲା ଏକଟି ପରିଷିକ୍ଷା ପୃଷ୍ଠାତରେ କାହିଁକି ହେଁ
ଏହି ଯେ, ହୀରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କାରାଯିବେ ଏ ପରିଷିକ୍ଷାର ବିଶିଷ୍ଟ କାରାଯିବେ ମହୋ ଏହିଲେ
ବାଧାକ ଏହିର ଉତ୍ତରର ବାପାରକ ବାହିନେର ଅଭିମତ ଏହିତି ଏକ ହତେ ଥାଦେ ନା ପରିଷିକ୍ଷା ମହୋ ଅନ୍ୟ
ଶୁଣୁଟିର ଶାବ୍ଦୀ-ଅନୁଭିତି, ଇନ୍ଦ୍ର-କାରାକୁ, ମମାକ-ଅନୁଭିତି ଓ ରାମ-କାରାକୁ କୋଣ
ମଞ୍ଚକ ହତେ ଥାଦେ ନା, ତାର ଚାନ୍ଦାନେର ବାପାରେ ସଦି କୋଣ ପାତିର ଦୂର ଦେବେ ନାହିଁ ଏହି ଶୁଣୁ
ହତେ ଥାଦେ ତାହିଁଲେ ତା ହବେ ତାର ମହାକେ ଚରିତ୍ରାନ୍ତା ଶୁଣୁ ଦେବର ଆବେ ଦେବେ
ମଞ୍ଚକରେ ନିଯେ ର କାରା ମାତ୍ରେ ମାନୁଷେର ମଞ୍ଚକ ଏକ ଧରନେର ନାହିଁ, କରେବ ଧରନେର ଏବଂ
ଅଭିମତ ଧରେଇ, ମେ ଏକଥାରେ ତାର ବାପାର ଚାନ୍ଦାନେ ମାନୁଷେର ଅଭିମଧୀନ, ଇନ୍ଦ୍ର
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବିଧ୍ୟତ ବନ୍ଦଧରଦେର ଉପର ଶୁଣୁଟିର ଶାତାତ ଆମେ, ଏ ଦୂରି ବାପାର କୋଣ ନିଯି
ଦିଯେ ଏକ, ଯାର ଫଳେ ଉତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ବାହିନେର ଏକହି ପରକୁତି ହତେ ହେଁ ଏକଟି ନିଯି,
ଅଥବା ଗୋପାମ କିମ୍ବା ମାନୁଷର ବାପାର କି କୋଣ ବାଧାକ
ମାତ୍ରାନେର ଯୋଗ୍ୟ ମୁସଲମାନେର ବାପାର ଯେକେ ସାମାନ୍ୟତମ ତିର ଅଥବା ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତରାନ୍ତରେ

দিক দিয়ে একটুখানিও কম? সে যদি নিজের চোখে নিজের স্তৰীকে কারোর সাথে ডগাতলি করতে দেখতো অথবা সে যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো যে, তার স্তৰী অন্য কারোর সংশ্পর্শে গর্ভবতী হয়ে গেছে, তাহলে তাকে লি'আন করার অধিকার না দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? আর এ অধিকার তার থেকে ছিনিয়ে নেবার পর আমাদের আইনে তার জন্য আর কি পথ আছে? কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য তো পরিকার জানা যায়। বিবাহিত দম্পত্তিদের মধ্যে স্তৰীর যথার্থ ব্যক্তিকার বা অবৈধ গর্ভধারণের ফলে একজন স্বামী এবং স্বামীর মিথ্যা অপবাদ বা স্তানের বৎশ অথবা অস্বীকারের ফলে একজন স্তৰী যে উচ্চিদি সমস্যায় ভুগতে থাকে কুরআন তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি উপায় বের করতে চায়। এ প্রয়োজন শুধুমাত্র সাক্ষদানের যোগ্য স্বাধীন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যেও এমন কোন জিনিস নেই যা এ প্রয়োজনটি শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তবে কুরআন লি'আনের কসমকে সাক্ষদান হিসেবে গণ্য করেছে তাই সাক্ষদানের শর্তাবলী এখানে আরোপিত হবে, এ যুক্তি পেশ করলে এর দাবী হবে, ন্যায়নিষ্ঠ গ্রহণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী স্বামী যদি কসম খায় এবং স্তৰী কসম খেতে ইতস্তত করে তাহলে স্তৰীকে রংম করা হবে। কারণ ব্যক্তিকারের ওপর সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বকর হচ্ছে, এ অবস্থায় হানাফীগণ রজম করার হুকুম দেন না। তারা নিজেরাই যে এ কসমগুলোকে হবহ সাক্ষের র্যাদা দান করেন না এটা তারাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। বরং সত্য বলতে কি স্বয়ং কুরআনও এ কসমগুলোকে সাক্ষ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করলেও এগুলোকে সাক্ষ গণ্য করে না। নয়তো স্তৰীকে চারটি কসমের পরিবর্তে আটটি কসম খাবার হুকুম দিতো।

পাঁচ : নিছক ইশারা-ইঁগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি'আন অনবার্য হয়ে পড়ে না। বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্যৰ্থহীন তাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় স্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সা'দ এর ওপর আরো এ শর্তটি বাড়ান যে, কসম খাবার সময় স্বামীকে বলতে হবে, সে নিজের চোখে স্তৰীকে ব্যক্তিকারে রত থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন শর্ত। কুরআনে এর কোন ভিত্তি নেই, হাদীসেও নেই।

ছয় : যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম যেতে ইতস্তত করে বা ইলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহযোগীগণ বলেন, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে যুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিয়ে তার বিরুদ্ধে কায়াফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেদ, হাসান ইবনে সালেহ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, লি'আন করতে ইতস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। তাই কায়াফের হন্দ ওয়াজিব হয়ে যায়।

সাত : স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্তৰী যদি লি'আন করতে ইতস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে যুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা তারপর যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ

উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্তু শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম থাচ্ছে না, তাই নিচিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা হচ্ছে, কুরআন এখানে ‘শাস্তির’ ধরন বলে দেয়নি বরং সংখারণভাবে শাস্তির কথা বলছে। যদি বলা হয়, শাস্তি মানে এখানে যিনার শাস্তি হতে পারে, তাহলে এর জবাব হচ্ছে, যিনার শাস্তির জন্য কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় চার জন সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেছে। নিচৰ এক জনের চারটি কসম এ শর্ত পূর্ণ করতে পারে না। স্বামীর কসম তো তার নিজের কায়াফের শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া এবং স্তুর উপর লি'আনের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তার মাধ্যমে স্তুর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। স্তুর জবাবী কসম থেতে অঙ্গীকার করার ফলে অবশ্যই সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয় এবং বড়ই গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু সন্দেহের ভিত্তিতে হৃদ জ্ঞার করা যেতে পারে না। এ বিষয়টিকে পুরুষের কায়াফের হন্দের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ তার কায়াফ তো প্রমাণিত, এ কারণেই তাকে লি'আন করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এর বিপরীতে স্তুর উপর যিনার অপবাদ প্রমাণিত নয়। কারণ তার নিজের স্বীকারোক্তি অথবা চারজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সাক্ষ ছাড়া তা প্রমাণিত হতে পারে না।

আটঃ যদি লি'আনের সময় স্তু গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার উরসজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেই বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অঙ্গীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সন্দেও তার উরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্তু যিনাকারিনী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে, যিনার কারণে জন্য নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

নয়ঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেই, ইমাম আহমাদ স্তুর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অঙ্গীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরি ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্তুকে এমন অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

দশঃ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অঙ্গীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর (সে গ্রহণ করাটা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন, সুস্পষ্ট শব্দাবলী ও বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক অথবা এমন কাজ করা হোক যাতে মনে হয় শিশুকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে যেমন, জন্মের পর মোবারকবাদ গ্রহণ করা অথবা শিশুর সাথে পিস্তসুলত মেহপূর্ণ ব্যবহার করা কিংবা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা) পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অঙ্গীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অঙ্গীকার করলে কায়াফের শাস্তির অধিকারী হবে। তবে পিতা

কতক্ষণ পর্যন্ত বৎশধারা অধীকার করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মালেকের মতে, স্ত্রী যে সময় গর্ভবতী ছিল সে সময় যদি স্বামী গৃহে উপস্থিত থেকে থাকে তাহলে গভসঞ্চারের সময় থেকে নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়-কালের মধ্যে স্বামীর জন্য সন্তানের বৎশধারা অধীকার করার সুযোগ আছে। এরপর তার অধীকার করার অধিকার নেই। তবে এ সময় যদি সে অনুপস্থিত থেকে থাকে এবং তার অসাঙ্ঘাতে সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে যখনই সে জানবে তখন তাকে অধীকার করতে পারে। ইমাম আবু হানীফার মতে, যদি জন্মের এক-দু'দিনের মধ্যে সে অধীকার করে তাহলে লি'আন করে সন্তানের দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক-দু'বছর পরে অধীকার করে তাহলে লি'আন হবে ঠিকই কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে বা জন্ম সম্পর্কে জানার পরে চল্লিশ দিনের মধ্যে পিতার বৎশধারা অধীকার করার অধিকার আছে। এরপর এ অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ চল্লিশ দিনের শর্ত অর্থহীন। সঠিক কথা সেটিই যেটি ইমাম আবু হানীফা বলেছেন। অর্থাৎ জন্মের পর বা জন্মের কথা জানার পর এক-দু'দিনের মধ্যেই বৎশধারা অধীকার করা যেতে পারে। তবে যদি এ ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে, যাকে যথার্থ বাধা বলে শীকার করে নেয়া যেতে পারে, তাহলে অবশ্য ডিই কথা।

এগারঃ যদি স্বামী তালাক দেবার পর সাধারণতাবে তালাকপ্রাণ্ত স্তৰীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে কায়াফের মাল্লা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী-স্তৰীর জন্য। আর তালাকপ্রাণ্ত নারীটি তার স্তৰী নয়। তবে যদি রঞ্জ'ই তালাক হয় এবং রঞ্জু (স্তৰীকে ফিরিয়ে নেবার) করার সময়-কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ডিই কথা। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে, এটি শুধুমাত্র এমন অবস্থায় কায়াফ হবে যখন কোন গর্ভস্থিত বা ভূমিষ্ঠ সন্তানের বৎশধারা গ্রহণ করা বা না করার সমস্যা মাঝখানে থাকবে না। অন্যথায় বায়েন তালাক দেবার পরও পূর্ণমের লি'আন করার অধিকার থাকে। কারণ সে স্তৰী লোককে বদনাম করার জন্য নয় বরং নিজেই এমন এক শিশুর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে লি'আন করছে যাকে সে নিজের বলে মনে করে না। ইমাম শাফেটীও প্রায় এই একই মত দিয়েছেন।

বারঃ লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতান্বেক্য সৃষ্টি হয়েছে।

যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ স্বামী ও স্তৰী উভয়েই কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হয় না। স্বামী যদি সন্তানের বৎশধারা অধীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে। নারীকে ব্যতিচারিনী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি'আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যার ফলে তার ব্যতিচারিনী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার অধিকার থাকবে না। যে ব্যক্তি লি'আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে 'হদে'র যোগ্য হবে। নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না। ইন্দত পালনকালে নারী পূর্ণমের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না। নারী ঐ পূর্ণমের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِاِلْفَكِ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شِرًا الْكَمْ
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرٍ يُعْنِيهِ مَا اَكْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِ وَالَّذِي
تَوَلَّ كِبِيرًا مِنْهُمْ لَهُ عَنِ ابْنَ عَظِيمٍ لَوْلَا اِذْ سِعْتُمُوهُ طَنِ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاِنْفُسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذِهِ اِلْفَكُ مِنْ

২ ঝংকু'

যারা এ মিথ্যা অপবাদ তৈরী করে এনেছে তারা তোমদেরই ভিতরের একটি অংশ।^১ এ ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে খারাপ মনে করো না বরং এও তোমদের ছন্য ভালই।^২ যে এর মধ্যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে আর যে ব্যক্তি এর দায়দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে।^৩ তার ছন্য তো রয়েছে মহাশান্তি। যখন তোমরা এটা শুনেছিলে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেন।^৪ এবং কেন বলে দাওনি এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা দোষারোপ।^৫

দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, নি'আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আদাদা হবে? দুই, নি'আনের ভিত্তিতে আদাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সত্ত্ব? প্রথম বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ নি'আন শেষ করবে, নারী জবাবী নিআন করুক বা না করুক তখনই সৎসৎ সংগেই হাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মাণেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফর বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন নি'আন শেষ করে তখন হাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ বলেন, নি'আনের ফলে হাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত হাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই হাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তাগাক দিয়ে দেয় তাহলে তাদো, অন্যথায় আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে হাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দ্বিতীয় বিষয়টিতে ইমাম মাণেক, আবু ইউসুফ, যুফর, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাত্বল ও হাসান ইবনে যিরাদ বলেন, নি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আদাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের ছন্য পরম্পরারের ওপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরম্পরার বিবাহ বল্বে আবাস্ত হতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। হযরত উমর (রা), হযরত আবী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও (রা) এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'দিদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহিম নাখচি, শা'বী, সাইদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মদ রাহেমাহমুদ্বাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা ধীকার করে নেয় এবং তার ওপর কায়াফের হদ জারি হয়ে যায় তাদের দু'জনের মধ্যে পুনর্বার বিয়ে হতে পারে।

তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরম্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষণ তারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৮. হ্যরত আয়েশার (রা) বিরলদ্বে যে অপবাদ রটানো হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ অপবাদকে “ইফ্ক” শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করে ব্যং আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ অপরাধকে পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। ‘ইফ্ক’ শব্দের অর্থ হচ্ছে, কথা উল্টে দেয়া, বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে দেয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটিকে ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর কোন দোষান্তোপ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলে তখন এর অর্থ হয় সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ।

এ সূরাটি নাযিলের মূলে যে ঘটনাটি আসল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল এখান থেকে তার ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। ভূমিকায় এ সম্পর্কিত প্রারম্ভিক ঘটনা আমি হ্যরত আয়েশার বর্ণনার মাধ্যমে উদ্ভৃত করেছি। পরবর্তী ঘটনাও তৌরই মুখ্যে শুনুন। তিনি বলেন : “এ মিথ্যা অপবাদের শুভজব কমবেশী এক মাস ধরে সারা শহরে ছড়াতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইই ওয়া সাল্লাম মারাত্তুক ধরনের মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকেন। আমি কাঁদতে থাকি। আমার বাপ-মা চরম পেরেশানী ও দৃংখে-শোকে ভুগতে থাকেন। শেষে একদিন রসূল্লাহ (সা) আসেন এবং আমার কাছে বসেন। এ সমগ্র সময়-কালে তিনি কখনো আমার কাছে বসেননি। হ্যরত আবু বকর (রা) ও উল্লে রুমান (হ্যরত আয়েশার মা) অনুত্ব করেন আজ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর কথা হবে। তাই তৌরা দু'জনও কাছে এসে বসেন। রসূল্লাহ (সা) বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌছেছে। যদি তুমি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার অপরাধ মুক্তির কথা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি তুমি সত্যিই গোনাহে নিষ্ঠ হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। বাদা যখন তার গোনাহ স্বীকার করে নিয়ে তাওবা করে তখন আল্লাহ তা মাফ করে দেন। একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে যায়। আমি আমার পিতাকে বলি, আপনি রসূল্লাহর কুরার জবাব দিন। তিনি বলেন : “মা, আমি কিছু বুবাতে পারছি না, কি বলবো।” আমি আমার মাকে বললাম, “তুমই কিছু বলো” তিনিও একই কথা বলেন, “আমি কি বলবো বুবাতে পারছি না।” একথায় আমি বলি, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে এবং তা মনের মধ্যে ঝমে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি নিরপরাধ—এবং আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমি নিরপরাধ—তাহলে আর্পনারা তা মেনে নেবেন না। আর যদি এমন একটি কথা আমি স্বীকার করে নিই যা আমি করিনি—আর আল্লাহ জানেন আমি করিনি—তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন। আমি সে সময় হ্যরত ইয়াকুবের (আ) নাম ঘৰণ করার চেষ্টা করি কিন্তু নামটি মনে করতে পারিনি। শেষে আমি বলি, এ অবস্থায় আমার জন্য এ ছাড়া আর কি উপায় থাকে যে, আমি সেই একই কথা বলি যা হ্যরত ইউসুফের বাপ বলেছিলেন (এখানে সে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যখন হ্যরত ইয়াকুবের সামনে তার ছেলে বিন ইয়ামিনের বিরলদ্বে চুরির অপবাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল : সূরা ইউসুফ ১০ রুক্তি'তে একথা আলোচিত হয়েছে)। একথা বলে আমি শুয়ে পড়ি এবং অন্যদিকে পাশ ফিরি। সে

সময় আমি মনে মনে বগছিলাম, আগ্রাহ ঘোনেন আমি গোনাহ করিনি, তিনি নিশ্চয়ই সত্য প্রকাশ করে দেবেন। যদিও একথা আমি করনাও করিনি যে, আমার ব্যক্তিকে অহী নাহিন হবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। আগ্রাহ নিষেই আমার পক্ষ সমর্থন করবেন। এ থেকে নিষেকে আমি অনেক নিষ্ঠার মনে করতাম। কিন্তু আমার ধারণা হিন্দি, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন খপ দেখবেন, যার মাধ্যমে আগ্রাহ আমার নির্দেশিতার কথা জানিয়ে দেবেন। এরি মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা) ওপর এমন অবগতি সৃষ্টি হয়ে গেলো যা অহী নাহিন হবার সময় হতো, এমন কি উৎপন্ন শৌকের দিনেও তাঁর মুবারক চেহার থেকে মুভোর মতো খেদবিলু ট্র্যাকে পড়তে পাকতো, আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। আমি তো ছিলাম একদম নিউকে, কিন্তু আমার বাপ-মার অবগু হিন্দি দেন কাটো শরীর থেকে একফোটা রঙও পড়তে না। তাঁরা তাঁর পাদিলি, না তাঁনি অগ্রাহ কি সত্য প্রকাশ করেন। যখন সে অবগু ব্যতী হয়ে গেলো তখন রসূলুল্লাহ (সা) হিন্দেন অত্যন্তে আনন্দিত। তিনি হেসে প্রথমে যে কথাটি বলেন, সেটি হিন্দি : মুবারক হোক আয়েশা! আগ্রাহ তোমার নির্দেশিতার কথা নাহিন করেছেন এবং এরপর নবী (সা) দশটি অন্তর্ভুক্ত শনান (অর্থাৎ ১১ নবর আয়াত হেকে ২০ নবর প্রত্যেক)। আমার মা বলেন, শন্তো এবং রসূলুল্লাহ (সা) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! আমি বলাম, “আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না, তোমাদের দুঃখের প্রতিও না। এবং আগ্রাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার নির্দেশিতার কথা নাহিন করেছেন তোমরা তো এ মিথ্যা অপবাদ অধীকারণ করনি।” (উদ্বেগ্য, এটি কোন একটি বিশেষ হাদীসের অনুবাদ নয় বরং হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে এ সম্পর্কিত যতগুলো বর্ণনা হয়েছে আয়েশা (রা) উক্ত হয়েছে সবগুলোর সার নির্দেশ আমি এখানে পরিবেশন করেছি।)

এ প্রসংগে আরো একটি সূৰ্য কথা অনুধাবন করতে হবে ইয়েত আয়েশার (রা) নিরপরাধ হবার কথা বর্ণনা করার আগে পুরো একটি ঝুঁক্তি তে দিনা, কায়ফ ও বি’আনের বিধান বর্ণনা করে মহান আগ্রাহ প্রকৃতপক্ষে এ সত্যটির ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছেন যে, যিনার অপবাদ দেবের ব্যাপারটি কোন হেবেংগো নয়, নিছক কেবল মাহফিলে হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য একে ব্যবহার করা থাবে না। এটি একটি মারাত্তুক ব্যাপার। অপবাদদাতার অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে তাকে সাহী আনতে হবে যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে তয়াবহ শাস্তি দেয়া থবে। আর অপবাদ যদি মিথ্যা হয় তাহলে অপবাদদাতা ৮০ ঘা বেগ্রাঘাত নাতের যোগ্য, যাতে ভবিষ্যতে সে আর এ ধরনের কোন কাজ করার দুঃসাহস না করে। এ অভিযোগ যদি খামী দিয়ে থাকে তাহলে আদানতে বি’আন করে তাকে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। একটাটি একবার খুঁকে উচ্চারণ করে কোন ব্যক্তি ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। কারণ এটা হচ্ছে একটি মুসলিম সমাজ। সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ব্যবহৃত কামের ফরার জন্য এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এখানে যিনা কোন আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিগত হতে পারে না। এবং এর আগোচনাও হাস্য রসালাপের বিষয়বস্তুতে পরিগত হতে পারে না।

৯. হাদীসে মাত্র কয়েকজন গোকের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা এ গুজুটি ইন্ডুস্ট্রি তাঁরা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রিফা’আহ (এ ব্যক্তি সত্বত রিহা’আহ ইবনে যায়েদ ইহুদী মুনাফিকের ছেলে), মিস্তাহ ইবনে উসামাহ, হাস্মান ইবনে সাবেত

ও হামনা বিনতে জাহশ এর মধ্যে প্রথম দু'জন ছিল মুনাফিক এবং বাকি তিনজন মু'মিন। মু'মিন তিন জন বিভাসি ও দুর্বলতার কারণে এ চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরা ছাড়া আর যারা কমবেশী এ গোনাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের নাম হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে আমার নজরে পড়েনি।

১০. এর অর্থ হচ্ছে, তয় পেয়ো না। মুনাফিকরা মনে করছে তারা তোমাদের ওপর একটা বিরাট আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইনশাল্লাহ এটি উল্টো তাদের ওপরই পড়বে এবং তোমাদের অন্য ভাণো প্রমাণিত হবে। যেমন আমি ইতিপূর্বে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের যে আসল ময়দান ছিল মুনাফিকরা সেখানেই তাদেরকে পরাম্পর করার জন্য এ প্রপাগাণ্ডা শুরু করে। অর্ধেৎ নৈতিকতার ময়দান। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার কারণে তারা প্রত্যেকটি ময়দানে নিজেদের প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় থাপ করে চলেছিল। আগ্রাহ তাকেও মুসলমানদের কল্যাণের উপকরণে পরিণত করে দিলেন। এ সময় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অন্যদিকে হযরত আবু বকর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর দিকে সাধারণ মু'মিনগণ যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন তা থেকে একথা দিবাগোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা অসংকৰ্ম থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, কতটা সংযম ও সহিষ্ণুতার অধিকারী, কেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও কি পরিমাণ তদু ও রুচিশীল মানসিকতার ধারক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তের ওপর যারা আক্রমণ চালিয়েছিল তাঁর একটি মাত্র ইঁগিতই তাদের শিরচেদের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এক মাস ধরে তিনি সবরের সাথে সবকিছু বরদাশ্ত করতে থাকেন এবং আগ্রাহের হকুম এসে যাবার পর কেবলমাত্র যে তিনজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কায়াফ তথা যিনার যিথ্য অপবাদের অপরাধ প্রমাণিত ছিল তাদের ওপর 'হদ' জারি করেন। এরপরও তিনি মুনাফিকদেরকে কিছুই বলেননি। হযরত আবু বকরের নিজের আত্মীয়, যার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ তিনি করতেন, সেও তাঁদের কলিজায় তাঁর বিধিয়ে দিতে থাকে কিন্তু এর জবাবে আগ্রাহের এ নেক বান্দাটি না তাঁর সাথে আত্মীয় সম্পর্ক ছির করেন, না তাঁর পরিবার-পরিজনকে সাহায্য-সহায়তা দেয়া বন্ধ করেন। নবীর পবিত্র স্তুগণের একজনও সতীনের দুর্নাম ছড়াবার কাজে একটুও অংশ নেননি। বরং কেউ এ অপবাদের প্রতি নিজের সামান্যতমও সঙ্গোষ, পছন্দ অথবা মেনে নেয়ার মনোভাবও প্রকাশ করেননি। এমনকি হযরত যয়নবের সহৃদের বোন হামনা বিনতে জাহশ নিছক নিজের বোনের জন্য তাঁর সতীনের দুর্নাম রটাছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং সতীনের পক্ষে ভাণো কথাই বলেন। হযরত আয়েশার নিজের বর্ণনা, রসূলের স্তুগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আড়ি চণ্ঠো আমার যয়নবের সাথে। কিন্তু 'ইফ্রক'-এর ঘটনা প্রসংগে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা সম্পর্কে তুম কি জানো? তখন এর জবাবে তিনি বলেন, হে আগ্রাহের রসূল! আগ্রাহের কসম, আমি তাঁর মধ্যে ভাণো ছাড়া আর কিছুই জানি না। হযরত আয়েশার নিজের তদ্বতা ও রুচিশীলতার অবস্থা এই ছিল যে, হযরত হাস্সান ইবনে সাবেত তাঁর দুর্নাম রটাবার ব্যাপারে উত্তোল্যযোগ্য অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এতদসংশ্লেষণ তিনি সবসময় তাঁর প্রতি সম্মান ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। গোকেরা খরণ করিয়ে দেয়, ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটিয়েছিলেন। কিন্তু এ জবাব দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করে দেন যে, এ ব্যক্তি ইসলামের শক্র কবি গোষ্ঠীকে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও

ইসলামের পক্ষ থেকে দৌতভাঙ্গ ঘৰাব দিতেন। এ ঘটনার সাথে যাদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল, এ ছিল তাদের অবস্থা। আর সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতা কতুর পরিষ্কার ছিল তা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, হয়রত আবু আইয়ুব আনসারীর দ্বী যখন তাঁর কাছে এ শুঁড়বগুলোর কথা বললেন তখন তিনি বলেন, “আইয়ুবের মাঃ যদি সে সময় আয়েশার ঘোরগায় তুমি হতে, তাহলে তুমি কি এমন কাজ করতে?” তিনি বলেন, “আগ্রাহী ক্ষম, আমি কখনো এমন কাজ করতাম না।” হয়রত আবু আইয়ুব বলেন, “তাহলে আয়েশা তোমার চেয়ে অনেক বেশী ভালো। আর আমি বলি কি, যদি সাফওয়ানের ঘোরগায় আমি হতাম, তাহলে এ ধরনের কথা কলনাই করতে পারতাম না। সাফওয়ান তো আমার চেয়ে ভালো মুসলমান।” এভাবে মুনাফিকরা যা কিছু চেয়েছিল ফল হলো তাঁর একেবারে উচ্চৈর এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব আগের ভুলনায় আরো বেশী সুপ্রসং হয়ে গেল।

এ হাড়া এ ঘটনার মধ্যে ক্ষণাগের আর একটি দিকও ছিল এই যে, এ ঘটনাটি ইসলামের আইন-কানুন, শিধি-বিধান ও তামাদুনিক নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের উপরকে পরিণত হয়। এর বদোগতে মুসলমানরা আগ্রাহী পক্ষ থেকে এমন সব নির্দেশ ধার করে যেগুলো কার্যকর করে মুসলিম সমাজকে চিরকানের দল্য অস্বৰূপের উৎপাদন ও সেগুলোর সম্প্রসারণ থেকে সংগৃহিত রাখা যেতে পারে আর অস্বৰূপ উৎপাদিত হয়ে দেবেও যথাসময়ে তার পথ ঝোধ করা যেতে পারে।

এ হাড়াও এর মধ্যে ক্ষণাগের আর একটি দিকও ছিল। মুসলমানরা সকলেই একটি ভাগোভাবে জেনে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ই খওয়া সাল্লাম অনুশ্য জনের অধিকারী নন। যা কিছু আগ্রাহ আনন তাই তিনি জানেন। এর বাইরে তাঁর জ্ঞান তত ক্ষুঁই যতক্ষুঁ জ্ঞান একান্ন মানুষের ধাকতে পারে। একমাস পর্যন্ত হয়রত আয়েশার (রা) ব্যাপারে তিনি ভীষণ গেরেশান থাকেন। কখনো চাকরানীকে ডিজেস করতেন, কখনো পিবিএ ছাঁপণকে, কখনো হয়রত অব্দীকে (রা), কখনো হয়রত উসামাকে (রা)। শেষ পর্যন্ত হয়রত আয়েশাকে (রা) ডিজেস করলেও এভাবে ডিজেস করেন যে, যদি তুমি এ গোলাহটি করে থাকো, তাহলে তাওবা করো আর না করে থাকো আমা করা যায় আগ্রাহ তোমার নিরপরাধ হওয়া প্রমাণ করে দেবেন। যদি তিনি অদ্য জ্ঞানের অধিকারী হিন্তেন তাহলে এ পেরেশানী, এ ডিজেসাবাদ এবং এ তাওবার উপদেশ কেন? তবে আগ্রাহী অহী যখন সত্য কথা জানিয়ে দেয় তখন সারা মাসে তিনি যা আনতেন না তা ধোনতে পারেন। এভাবে আকীদার অহ আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধারণত দোকেরা নিজেদের নেতৃবর্গের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি ও আতিশয়ের শিকার হয়ে থাকে তা থেকে আগ্রাহ সরাসরি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বৌচাবার ব্যবস্থা করেন। বিচ্ছিন্ন নয়, এক মাস পর্যন্ত অহী না পাঠ্ঠাবার পেছনে আগ্রাহীর এ উদ্দেশ্যটাও থেকে থাকবে। প্রথম দিনেই অহী এসে গেলো এ ফায়দা ধার করা যেতে পারতো না। (আরো বেশী বিস্তারিত জ্ঞান দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন্ন নামুল, ৮৩ টাকা।)

১১. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে ছিল এ অপবাদচির মূল রচয়িতা এবং এ কদর্য প্রচারাভিযানের আসল নায়ক। কোন কোন হাদীসে ভুলক্রমে হয়রত হাস্সান ইবনে সাবেতকে (রা) এ আয়াতের লক্ষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা মূলত বর্ণনাকারীদের নিজেদেরই বিভাসির ফল। নয়তো হয়রত হাস্সানের (রা) দুর্বলতা এর চেয়ে বেশী কিছু

ঠিক না যে, তিনি মুনাফিকদের ছড়ানো এ ফিত্নায় জড়িয়ে পড়েন। হাফেয় ইবনে কাসীর যথার্থ বলেছেন, এ হাদীসটি যদি বুখারী শরীফে উন্নত না হতো, তাহলে এ প্রসংগটি আলোচনায়োগ্যই হতো না। এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় মিথ্যা বরং মিথ্যা অপবাদ হচ্ছে এই যে, বর্ণ উমাইয়াহ হয়রত আলী রাদিয়াত্তাহ আনহকে এ আয়াতের লক্ষ মনে করে। বুখারী, তাবারানী ও বাইহাকীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক উমুবীর উকি উন্নত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, **كُبْرَى تَوْلِي** অর্থ হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালেব। অর্থে এ ফিত্নায় হয়রত আলীর (রা) গোড়া খেকেই কোন অংশ ছিল না। ব্যাপার শুধু এতটুকু ছিল, যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশী প্রেরণ দেখেন তখন নবী (সে) তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়ায় তিনি বলেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাকে কোন সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ রাখেননি, বহু মেয়ে আছে, আপনি চাইলে আয়েশাকে তালাক দিয়ে আর একটি বিয়ে করতে পারেন। এর অর্থ কখনোই এটা ছিল না যে, হয়রত আয়েশার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছিল হয়রত আলী তাকে সত্য বলেছিলেন। বরং শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণানী দূর করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

১২. অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, নিজেদের লোকদের অথবা নিজেদের সমাজের লোকদের ব্যাপারে তালো ধারণা করোনি কেন? আয়াতের শব্দাবলী দু'ধরনের অর্থের অবকাশ রাখে। আর এ ঘৰ্থবোধক বাক্য বাবহারের মধ্যে রয়েছে একটি গভীর তত্ত্ব। এটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। হয়রত আয়েশা (রা) ও সাফতওয়ান ইবনে মু'আতালের (রা) মধ্যে যে ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল তা তো এই ছিল যে, কাফেলার এক ভদ্র মহিলা (তিনি নবী পত্নী ছিলেন একথা বাদ দিলেও) ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। আর কাফেলারই এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এখন যদি কেউ বলে, নাউয়ুবিন্নাহ এরা দুজন নিজেদেরকে একাত্তে পেয়ে গোনাহে লিঙ্গ হয়ে গেছেন, তাহলে তাঁর একথার বাহ্যিক শব্দাবলীর আড়ালে আরো দু'টো কান্ননিক কথাও রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, বক্তা (পুরুষ হোক বা নারী) যদি নিজেই ঐ জ্ঞায়গায় হতেন, তাহলে কখনোই গোনাহ না করে থাকতেন না। কারণ তিনি যদি গোনাহ থেকে বিরত থেকে থাকেন তাহলে এটা শুধু এ জন্য যে, বিপরীত লিংগের কেউ এ পর্যন্ত এভাবে একাত্তে তাঁর নাগালে আসেনি নয়তো এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবার লোক তিনি নন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে সমাজের তিনি একজন সদস্য, তাঁর নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা হচ্ছে, এখানে এমন একজন নারী ও পুরুষ নেই যিনি এ ধরনের সুযোগ পেয়ে গোনাহে লিঙ্গ হননি। এতো শুধুমাত্র তখনকার ব্যাপার যখন বিষয়টি নিছক একজন পুরুষ ও একজন নারীর সাথে জড়িত থাকে। আর ধরনে যদি সে পুরুষ ও নারী উভয়ই একই জ্ঞায়গার বাসিন্দা হন এবং যে মহিলাটি ঘটনাক্রমে কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ঐ পুরুষটির কোন বক্তু, আত্মীয় বা প্রতিবেশীর স্ত্রী, বোন বা মেয়ে হয়ে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটি আরো গুরুতর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ এ দীভূত যে, বক্তা নিজেই নিজের ব্যক্তিসম্পত্তি সম্পর্কে এবং নিজের সমাজ সম্পর্কেও এমন জগন্য ধারণা পোষণ করেন যার সাথে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের দূরতম সম্পর্কও নেই। কে এমন সজ্জন আছেন যিনি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, তাঁর কোন বক্তু, প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তির গৃহের কোন মহিলার সাথে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর পথে দেখা হয়ে যাবে এবং

প্রথম এবঝয়ই তিনি তার ইচ্ছিত শুভে মেবার কাজ করবেন তারপর তাকে গৃহে পৌছিয়ে দেবার কথা চিন্তা করবেন। কিন্তু এখনে তো ব্যাপার হিল এর চেয়ে হাতার শুগ পরিষ্ঠির মহিলা অন্য কেউ হিসেন না, তিনি হিসেন খায়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, যাদেরকে প্রত্যেকটি মুসলমান নিজের মাঝে চেয়েও বেশী সংশয়ের যোগ্য মনে করতো এবং যাদেরকে আগ্রাহ নিষেই প্রত্যেক মুসলমানের উপর নিজের মাঝের মতই হারাম গণ্য করেছিলেন শুন্দরি কেবলমাত্র ঐ কাজের একটি সদস্য, এ সেনাদলের একটি সৈন্য এবং ঐ শহরের একজন অধিবাসীই হিসেন না বরং তিনি মুসলমানও ছিলেন ঐ মহিলার ঘারীভূতে তিনি আগ্রাহ রসূল এবং নিজের নেতো ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছিলেন আর তাঁর হৃষুমে খাগ উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য বদরের যুদ্ধের মতো ভয়াবহ তিহাদে খং নিয়েছিলেন এ অবস্থায় তো এ উভিত্তির ঘনস্তুক প্রেক্ষাপট ইন্দ্রজাতার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায় যার চেয়ে নেতো ও ধৃণ্য কোন প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তাই করা যায় না। তাই মহান আগ্রাহ বাস্তুন, মুসলিম সমাজের যেসব ব্যক্তি একথা তাদের কঠে উচারণ করেছে অথবা কথপকে একে সদেহযোগ্য মনে করেছে তারা নিম্নের মন-মানসিকতায়ও খুবই খারাপ ধৰণে দিয়েছে এবং নিম্নের সমাজের গোকদেরকেও অত্যন্ত ইল চরিত্র ও নিকৃষ্ট নৈতিকবৃত্তির অধিকারী মনে করেছে-

১৩. অর্থাৎ একথাতে বিচেনার যোগ্যই হিল না একথা শোনার সাথে সাময়িক প্রত্যেক মুসলমানের একে সুস্পষ্ট মিথ্যার, মিথ্যা ও বানোয়াতি করা ও অপবাদ অর্থাৎ দেয়া উচিত হিল স্বত্বত কেউ এখানে শুশ্র করতে পারে, এরথাই যদি তীক হয়ে থাকে, তাহলে খং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিন্ধীক রাদিয়াল্লাহ আনহুই বা প্রথম দিনই একে মিথ্যা বলে দিশেন না কেন? কেন তারা একে এতটা শুরুত্ব দিশেন? এর অবস্থা হচ্ছে, থার্মো ও পিতায় অবস্থা সামাজিক গোকদের ভূলনায় তিনি ধরনের হয়। যদিও হীফে থার্মো চেয়ে বেশী কেউ চিনতে বা জানতে পারে না এবং একজন সৎ, তদ্ব ও সত্রস্ত স্ত্রী সম্পর্কে কোন সুখ কৃতি সম্পর্ক থার্মো গোকদের অপবাদের কারণে খারাপ ধৰণে করতে পারে না, তবুও যদি তার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তখন সে এমন এক ধরনের সংকটের খুঁয়োয়ুঁয়ি হয় যার হাতে সে একে মিথ্যা অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করলেও প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ হবে না বরং তারা নিষেদের কঠ আরো এক ডিঝো উচ্চতে চড়িয়ে দেবাতে থাকবে, দেখো, এট কেমন থার্মো বুঝিকে আন্দৱ করে রেখেছে, সববিকু করে যাবে আর থার্মো মনে করবে আমার হী বড়ই সতী সামুদ্রী। এ ধরনের সংকট মা-বাপের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় সে বেচারায়া নিম্নের মেয়ের সংতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে যদি মুখ ফেলেও তাহলে মেয়ের অবস্থান পরিষ্কার হয় না। প্রচারণাকারীরা একথাই বলবে, মা-বাপ গো, কাবৈই নিজের মেয়ের পক্ষ সমর্থন করবে না তো আর কি করবে! এ তিনিসটাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইয়েল আবু বকর ও উষ্মে রূমানকে তিতোয়ে তিতোয়ে শোকে-দুঃখে জর্জরিত ও বিহবল করে চাপ্পিল; নয়তো আসলে তাদের মনে কেবল সদেহ ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর ভায়ণে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং যে উভিত্তির সম্পর্কে এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যেও না।

لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهْدَاءِ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْ أَنَّ اللَّهَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ لَهُمُ الْمُسْكِنُ فِي مَا أَفْسَرْتُ فِيهِ عَنِ الْأَبْعَادِ ۝ إِذَا تَلَقَوْنَهُ
بِالسِّنَّتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَاهِكُمْ مَا لِي سَلَكَ رَبِّيْهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ
هِنَّا ۝ وَهُوَ عِنْ أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ ۝

তারা (নিজেদের অপবাদের প্রমাণ শুরুপ) চারজন সাক্ষী আনেনি কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী আনেনি তখন আগ্নাহুর কাছে তারাই মিথ্যক। ১৪ যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়ায় ও আবেরাতে আগ্নাহুর অনুগ্রহ ও করণা না হতো তাহলে যেসব কথায় তোমরা লিখ হয়ে গিয়েছিলে সেগুলোর কারণে তোমাদের ওপরে মহাশাস্তি নেমে আসতো। (একটু ভেবে দেখো তো, সে সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল করছিলে) যখন তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যা সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা একে একটা মামুলি কথা মনে করছিলে অথচ আগ্নাহুর কাছে এটা ছিল শুরুতর বিষয়।

১৪. "আগ্নাহুর কাছে" অর্থাৎ আগ্নাহুর আইনে অথবা আগ্নাহুর আইন অনুযায়ী। নয়তো আগ্নাহ তো জানতেন এই অপবাদ ছিল মিথ্যা। তারা সাক্ষী আনেনি বলেই তা মিথ্যা, আগ্নাহুর কাছে তার মিথ্যা হবার জন্য এর প্রয়োজন নেই।

এখনে যেন কেউ এ ভুল ধারণার শিকার না হন যে, এ ক্ষেত্রে নিছক সাক্ষীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে অপবাদের মিথ্যা হবার যুক্তি ও ভিত্তি গণ্য করা হচ্ছে এবং মুসলিমানদের বলা হচ্ছে যেহেতু অপবাদদাতা চার জন সাক্ষী আনেনি তাই তোমরাও শুধুমাত্র এ কারণেই তাকে সুম্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করো। বাস্তবে স্থানে যা ঘটেছিল তার প্রতি দৃষ্টি না দিলে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। অপবাদদাতারা এ কারণে অপবাদ দেয়নি যে, তারা তাদের মুখ দিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছিল তারা সবাই বা তাদের কোন একজন শুচক্ষে তা দেখেছিল। বরং হ্যরত আয়েশা (রা) কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং হ্যরত সাফ্ডার পরে তাঁকে নিজের উটের পিঠে সওয়ার করে কাফেলার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন শুধুমাত্র এরি ভিত্তিতে তারা এতবড় অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি এ অবস্থায় হ্যরত আয়েশার এভাবে পিছনে থেকে যাওয়াকে নাউয়বিগ্যাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে ভাবতে পারতেন না। সেনা প্রধানের স্তু চুপিচুপি কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সাথে থেকে যাবে তারপর ঐ ব্যক্তিই তাকে নিজের

وَلَوْلَا إِذْ سِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمْ بِهِنَّ أَقْسَبَ حَنْكَ هَنَّ
 بِهَنَّا نَعْظِيمٌ^১ يَعْظِمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعْوِدُوا إِلَيْهِ أَبْدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^২
 وَيَبْيَسْ إِنَّ اللَّهَ لَكُمُ الْأَيْتِ^৩ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^৪ إِنَّ الَّذِينَ يَحْبُّونَ
 أَنْ تَشْيَعَ الْفَاجِسَةُ^৫ فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا^৬ الْهُرُمُ عَنْ أَبْ^৭ الْيَمِّ^৮ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ^৯ وَاللَّهُ يَعْلَمُ^{১০} وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُونَ^{১১} وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ^{১২} وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^{১৩}

একথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা বলে দিলে না কেন, “এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা আমাদের শোভা পায় না, সুব্হানাল্লাহ! এ তো একটি অঘন্য অপবাদ!” আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, যদি তোমরা মু’মিন হয়ে থাকো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।^{১৫}

যারা চায় মু’মিনদের সমাজে অশ্রীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোগ করবে।^{১৬} আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।^{১৭} যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করম্য তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে হড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ।।।)

উটের পিঠে বসিয়ে প্রকাশ্য দিবাগোকে ঠিক দুপুরের সময় সবার চোখের সামনে দিয়ে সেনা ছাউনিতে পৌছে যাবে, কোন ষড়যন্ত্রকারী এভাবে ষড়যন্ত্র করে না। স্বয়ং এ অবস্থাটাই তাদের উভয়ের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এ অবস্থায় যদি অপবাদদাতারা নিজেদের চোখে কোন ঘটনা দেখতো তাহলে কেবলমাত্র তারি ভিত্তিতে অপবাদ দিতে পারতো। অন্যথায় যেসব লক্ষণের ওপর কুচক্রেঁরা অপবাদের ভিত্তি রেখেছিল সেগুলোর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৫. এ আয়াতগুলো এবং বিশেষ করে আল্লাহর এ বাণী “মু’মিন পুরুষ ও নারীরা নিজেদের লোকদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে না কেন” থেকে এ মূলনীতির উৎপত্তি হয় যে, মুসলিম সমাজে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের ভিত্তি সুধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কুধারণা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় পোষণ করা উচিত যখন তার জন্য কোন ইতিবাচক ও প্রমাণসূচক ভিত্তি থাকবে। এ ব্যাপারে নীতি হচ্ছে : প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ,

يَا يَهُآلِّيْنَ اَمْنَوْا لَا تَتَبَعُوا خَطُوْتَ الشَّيْطِنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعُ خَطُوْتَ
 الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَرْتُكُمْ مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا ۝ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرِكُمْ مِنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ۝ وَلَا يَأْتِيْلُ أَرْلُوْا الْفَضْلِ مِنْ كُمْ وَالسَّعَةُ
 أَنْ يُؤْتَوْا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفِحُوا ۝ أَلَا تَحْبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩. রঞ্জক'

হে ইমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার
 অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও ব্যারাপ কাজ করার হস্ত দেবে। যদি
 তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কর্মণা না থাকতো তাহলে তোমাদের
 একজনও পবিত্র হতে পারতো না।^{১৮} কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে
 দেন এবং আল্লাহ ধ্বনকারী ও জ্ঞাত।^{১৯}

তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাচুর্য ও সামর্থের অধিকারী তারা যেন এ মর্মে
 ক্ষম থেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আলীয়-বজন, গরীব-মিসকীন ও
 আল্লাহর পথে গৃহত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে ক্ষমা করা ও
 তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের
 মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীলতা ও দয়া শুণে শুণাবিত।^{২০}

যতক্ষণ তার অপরাধী হবার বা তার প্রতি অপরাধের সন্দেহ করার কোন যুক্তিসংগত
 করণ না থাকে আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্যবাদী, যতক্ষণ তার অনিভুবযোগ্য হবার কোন
 প্রমাণ না থাকে।

১৬. পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আয়াতের প্রত্যক্ষ অর্থ হচ্ছে, যারা এ ধরনের
 অপরাধ তৈরী করে ও তা প্রচার করে মুসলিম সমাজে চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটাবার এবং
 উচ্চতে মুসলিমার চরিত্র ইননের চেষ্টা করছে তারা শাস্তিশালের যোগ্য। কিন্তু আয়াতের
 শব্দাবলী অশ্লীলতা ছড়াবার যাবতীয় অবস্থার অর্থবোধক। কার্যত ব্যক্তিচারের আড়া
 কায়েম করার ওপরও এগুলো প্রযুক্ত হয়। আবার চরিত্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সে
 জন্য আবেগ-অনুভূতিকে উদ্বিপিত ও উপেজিতকারী কিসসা-কাহিনী, কবিতা, গান, ছবি

ও কোণার উপর শয়ুক্ত হয়। ভাজড়া এমন ধরনের দেব, যেটি ও বন্যান প্রতিষ্ঠানও এই ধরণভায় এসে থাই দেখানে নারী-পুরুষের মিথিত সূতা ও পুরিত শয়ুক্ত ফুটির ব্যবহা করা হয়। কুরুক্ষেত্র পর্যায়ে বলছে, এরা স্বার্থ কল্পনার দেব। আবেগাতেই নয়, সুনিষ্ঠায়ত এসের পাতি পাঞ্চাঙ্গ চতিত কাটে। কুরুক্ষেত্র এসব পাঞ্চ উপকরণের পথ দ্রেশ করা এবং ইস্তামৌ গাত্রের অপরিহৰ্য বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র এবং দেখানে যে সমস্ত কাটতে পারে দ্বিতীয়ে অপরাধ এখন করতে, এবং দেওয়ো সম্পদনবাণীকে প্রটিনাতের দেশে বলে ধারাসন দিতে ইস্তামৌ গাত্রে দক্ষিণ এসে সমস্ত কাট শান্তিযোগ ও পুরিশে ক্ষেত্রেশনাতের উপরে হওয়ে হবে।

১৭. অর্থাৎ তোমরা কানো না এ ধরনের এক একটি কাটের অঙ্গে সমৃদ্ধ হোবার কোথায় সৌহৃদ থাই, কৃত্যের এক্তিনেতে ইতিবিত হয় এবং সমার্থকতারে এই তি পরিমাণ কৃতি সমাদ পৌবনভে বৃদ্ধাগত করতে হয়। এ বিষ্টু একাহুব দ্বাৰা তাজোত্তমে আনন্দ কাটে। অগ্নিহুত উপর নিত্যের কর্তৃ এবং তিনি ইসব অস্তক। কাটে এসে আবেগ কোনো পূর্ণ শক্তিতে সেওঁগোকে নিষিদ্ধ করার ও নারিতে দেবৰ চো কর্তৃ এবং তো বিদ্যু নয় যে, এক্তিনের পাতি দোষতা ধূমর্ণন করতে হবে বাসনে একটি নেতৃত্বে এক বিদ্যু কাটে। থারা এসব কাট করবে তাদের কঠোর পাতি ইওয়া চিত্ত।

১৮. অর্থাৎ শুভতান গো তোমাদের স্বার্থ অসংকলনের সাধারণ প্রতিক্রিয়া দেবৰ ক্ষেত্রে এমন উন্মুখ হয়ে দাসে কাটে যে, যদি অগ্নাহ নিলেই অনুভুব ও সূর্য প্রভে তোমাদের সততা ও অসঙ্গতির পাবণা না পেতেন এবং তোমাদের স্বার্থাদলে প্রিয়া ও সুযোগান্বয়ের সৌভাগ্য সান না করেন, তাহলে তোমাদের এবং নান নিলে শোক-সাময়ের ঘোতে পরিদ্রো ও পাশ প্রতিক্রিয়া দেকে মৃত হওতে পারো না।

১৯. অর্থাৎ অগ্নাহ কোথ হব করে, অস্তকে থাকে তাবে পরিতো দান করেন না কেবল নিলের নিষিদ্ধ চৈনের তিউতি সন্ত করেন। অগ্নাহ নিলেন কে কোথ চায় এবং কে কে অক্ষয়ণ অক্ষয়কৃ প্রতেক ব্যক্তি কোথে দেসব কৰা যাব। অগ্নাহ তা স্বার্থ ও নে থাকেন। প্রতেক ব্যক্তি মনে মনে যা চুক্তি করে অগ্নাহ তা দেকে মেঘে দেবৰের পাদেন না, এ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ চৈনের তিউতি অগ্নাহ ফারসনা করেন, একে পরিত্রিতা দান করবেন ও কাকে পরিত্রিতা দান করবেন না।

২০. হ্যুত আয়োজ রো বরেন, উপরে বশিত অগ্নিতপ্তিনেতে ইহান অগ্নাহ ইহন আমার নির্দেশিতোর কথা দেখেন করেন তখন হ্যুত অগ্নু বক্র রো বস্তু দেয়ে কর্মসন, তিনি আগামিতে মিস্তুব হবনে উসাপকে সাহায্য করা বাব করে দেবেন, তারপর দ্বিতীয় অগ্নাম-সম্পর্কের কোন পরোক্ষ করেননি এবং তিনি সারা ঐবন ভুক্ত ও ভার সমস্ত পরিবারের যে উপকরণ করে এসেছেন সে দেনা এক্ষুণ্ড নান অনুভুব করেননি। এ চৈনায়। এ আয়োজ নাবিন হয় এবং এ অস্তক উন্নেহ হ্যুত অগ্নু বক্র রো বস্তু দেয়ে করেন, হে আমাদের রূব। তৃষ্ণি আমাদের তু-ত্রাতি শাক করে দেবে। আবেগ তিনি এই মিস্তুবকে সাহায্য করতে থাকেন এবং এবার আমার চেয়ে বেশী করা করতে থাকেন। হ্যুত আবদুগ্নাহ ইহনে আশ্বাসের (রো) বর্ণনা হয়ে, হ্যুত অগ্নু বক্র ভাজা করে করেক্ষণ সাহার্বীও এ কসম দেয়েছিলেন যে, যারা যিথ্যা অপরদ ভুত্তাতে দখ নিয়ে।

তাদেরকে তাঁরা আর কোন সাহায্য সহায়তা দেবেন না। এ আয়াতটি নাফিল হবার পর তারা সবাই নিজেদের কসম ভেঙে ফেলেন। এভাবে এ ফিত্নার ফলে মুসলিম সমাজে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তা এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে এতে কোন কল্যাণ নেই এবং এর ফলে কসম ভেঙে ফেলে যে বিষয়ে কল্যাণ আছে তা অবলম্বন করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে কি না। এক দল যকীন বলেন, কল্যাণের পথ অবলম্বন করাই কাফ্ফারা, এ ছাড়া আর কোন কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই। তারা এ আয়াত থেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ হ্যরত আবু বকরকে কসম ভেঙে ফেলার হকুম দেন এবং কাফ্ফারা আদায় করার হকুম দেননি। এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তিটিকেও তারা যুক্তি হিসেবে পেশ করেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيَاتِ الَّذِيْ مُوْخِيرٌ
وَذَلِكَ كُفَّارَتُهُ -

“যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয়টি তার চেয়ে ভালো, এ অবস্থায় তার ভালো বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত এবং এই ভালো বিষয়টি গ্রহণ করাই তার কাফ্ফারা।”

অন্য দলটি বলেন, কসম ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ কুরআন মজীদে একটি পরিক্ষার ও স্বতন্ত্র হকুম নাফিল করেছেন (আল বাকারাহ ২২৫ ও আল মায়েদাহ ৮৯ আয়াত)। এ আয়াতটি ঐ হকুম রহিত করেনি এবং পরিকারভাবে এর মধ্যে কোন সংশোধনও করেনি। কাজেই ঐ হকুম স্বাক্ষরে অপরিবর্তিত রয়েছে। আল্লাহ এখানে হ্যরত আবু বকরকে অবশ্যি কসম ভেঙে ফেলতে বলেছেন কিন্তু তাঁকে তো এ কথা বলেননি যে, তোমার শুপরি কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটির অর্থ হচ্ছে শুধু এই যে, একটি ভূল ও অসংগত বিষয়ের কসম খেয়ে ফেললে যে গুনাহ হয় সঠিক ও সংগত পক্ষে অবলম্বন তার অপনোদন হয়ে যায়। কসমের কাফ্ফারা রহিত করা এর উদ্দেশ্য নয়। কস্তুরঃ অন্য একটি হাদীস-এর ব্যাখ্যা করে দেয়। তাতে নবী করীম (সা) বলেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيَاتِ الَّذِيْ مُوْخِيرٌ
وَلِيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ -

“যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয় তার চেয়ে ভালো, তার যে বিষয়টি ভালো সেটিই করা উচিত এবং নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করা উচিত।”

এ থেকে জানা যায়, কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা আলাদা জিনিস এবং ভালো কাজ না করার গোনাহের কাফ্ফারা অন্য জিনিস। ভালো কাজ করা হচ্ছে একটি জিনিসের কাফ্ফারা

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسِنَاتِ الْغَفِيلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعِنْوَافِ الدُّنْيَا^١
 وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ^٢ يَوْمًا تَشَهَّدُ عَلَيْهِمُ الْأَسْنَتُ هُمْ
 وَأَيْلَيْهِمْ وَأَرْجَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^٣ يُوصَلُنَّ يَوْمَ فِيهِمْ أَللَّهُ دِينُهُمْ
 الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ^٤ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ
 وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِ^٥ وَالْطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالْطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ^٦
 ۚ^٧ اُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ^٨

যারা সতী সাক্ষী, সরলমনা^১ মু'মিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কঠ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ দেবে।^২(ক) সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।

দুচরিত্ব মহিলারা দুচরিত্ব পুরুষদের জন্য এবং দুচরিত্ব পুরুষরা দুচরিত্ব মহিলাদের জন্য। সচরিত্ব মহিলারা সচরিত্ব পুরুষদের জন্য এবং সচরিত্ব পুরুষরা সচরিত্ব মহিলাদের জন্য। লোকে যা বলে তা থেকে তারা পৃত-পবিত্র।^৩ তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।

এবং হিতীয় জিনিসের কাফ্ফারা কুরআন নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাদের ব্যাখ্যা, ৪৬ টিকা)।

২১. মূলে (গাফেলাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সরলমনা ও ভদ্র মহিলারা, যারা ছল-চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল, কল্যাণমুক্ত ও পাক-পবিত্র, যারা অসত্যতা ও অশ্রুল আচরণ কি ও কিভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ তাদের বিকল্পে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম বলেছেন, নিকশূ-সভী-সাক্ষী মহিলাদের বিকল্পে অপবাদ দেয়া সাতটি "সর্বনাশা" কবীরাহ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাবারানীতে ইয়রত হয়াইফার বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন :

قذف المحسنة بهدم عمل ماء سنة

“একজন নিরপেরাধ সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া একশ বছরের সৎকাজ
ধৰ্মস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।”

২১(ক). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৫৫ এবং সূরা
হা-মীম আসু সাজ্দাহ, ২৫ টীকা।

২২. এ আয়াতে একটি নীতিগত কথা বুঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে : দুর্চরিত্রে
দুর্চরিত্রের সাথেই জুটি বাধে এবং সচরিত্র ও পাক-পবিত্র লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই
সচরিত্র ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথেই মানানসই। একজন দৃঢ়ত্বকারী শুধু
একটিমাত্র দৃঢ়ত্ব করে না। সে আর সব দিক দিয়ে একদম ভালো এবং শুধুমাত্র একটি
দুর্কর্মে নিষ্ঠ—ব্যাপারটা মোটেই এ রকম নয়। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ,
স্বত্ব-চরিত্র সবকিছুর মধ্যে নানান অসংগ্রহণতা লুকিয়ে থাকে এবং এগুলো তার একটি
বড় অসংগ্রহণতাকে সহায়তা দান ও প্রতিপালন করে। কোন ব্যক্তির মধ্যে ইঠাঁ একটি
অসংগ্রহণতা কোন অদৃশ্য গোলার মতো বিফেরিত হয়ে চারদিকে ছাড়িয়ে পড়বে, অথচ
এর কোন আলামত ইতিপূর্বে তার চালচলন ও আচার-আচরণে দেখা যায়নি, এটা
কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। মানব জীবনে প্রতিনিয়ত এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটির
প্রদর্শনী হচ্ছে। একজন পাক-পবিত্র মানুষ, যার সমগ্র জীবন সবার সামনে সুস্পষ্ট, সে
একটি ব্যতিচারী নারীর সাথে ঘর সংসার করে এবং বছরের পর বছর তাদের মধ্যে গভীর
প্রেম ও প্রতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, একথা কিভাবে বোধগম্য হয়? একথা কি চিন্তা করা
যেতে পারে যে, কোন নারী এমনও হতে পারে যে ব্যতিচারিনী হবে এবং তারপর তার
চলন-বলন, অংগভংগী, আচার-ব্যবহার কোন জিনিস থেকেও তার এসব অসংবৃতির
কোন লক্ষণই ফুটে উঠবে না? অথবা কোন ব্যক্তি পবিত্র স্বদয়বৃত্তির অধিকারী ও উন্নত
চারিত্রিকানও হবে আবার সে এমন নারীর প্রতি সন্তুষ্টও থাকবে যার মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা
যাবে? একথা এখানে বুঝাবার কারণ হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে যদি কাঙ্গার প্রতি এ
অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে লোকেরা যেন অঙ্গের মতো তা শুনেই বিশ্বাস করে না নেয়,
বরং তারা যেন চোখ খুলে দেখে নেয় কার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, কি অপবাদ দেয়া
হচ্ছে এবং তা কোনভাবে সেখানে খাপ খায় কি না? কথা যদি জুতসই হয়, তাহলে
মানুষ এক পর্যায় পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতে পারে অথবা কমপক্ষে সম্ভব মনে করতে
পারে। কিন্তু উন্টট ও অপরিচিত কথা, যার সত্যতার স্বপক্ষে একটি চিহ্নও কোথাও খুঁজে
পাওয়া যায় না, তা শুধুমাত্র কোন নির্বোধ বা দুর্জনের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই তাকে
কেমন করে মেনে নেয়া যায়?

কোন কোন মুফাস্সির এ আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, খারাপ কথা খারাপ
লোকদের জন্য (অর্থাৎ তারা এর হকদার) এবং তালো কথা তালো লোকদের জন্য, আর
তালো লোকদের সম্পর্কে দুর্ঘ্যেরা যেসব কথা বলে তা তাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া থেকে
তারা মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কিছু লোক এর অর্থ করেছেন এভাবে, খারাপ কাজ খারাপ
লোকদের পক্ষেই সাজে এবং তালো কাজ তালো লোকদের জন্যই শোভনীয়, তালো
লোকেরা খারাপ কাজের অপবাদ বহন থেকে পবিত্র। তিনি কিছু লোক এর অর্থ নিয়েছেন:
এভাবে, খারাপ কথা খারাপ লোকদেরই বলার মতো এবং তালো লোকেরা তালো কথাই
বলে থাকে, অপবাদদাতারা যে ধরনের কথা বলছে তালো লোকেরা তেমনি ধরনের কথা বলা

أَنْهَا أَلِّيْنَ أَسْنَا لَنْدَ حُوَّا بَيْوَةَ غِيرَ بَيْوَ تَكْرَهْتَى تَسْتَائِسْوا
وَتَسْتَمْوَاعَى أَنْبِيَهَ ذِكْرَ خَيْرٍ لَكَمْ تَسْكَرَ نَذْ كَرْوَ

ସ ୬୩

ହେ ଉତ୍ତରପୂର୍ବର ଗୀତ ନିଜେ ମେଘ ପୂର୍ବ ପାତା ଅନ୍ତର ପୂର୍ବ ଧରେ ଥିଲେ କବଳୋ ନା ଯତ୍ତର
ନା ଶୁଦ୍ଧାସୌଦେଶ ମହାତି ଏତ କବଳେ^{୧୫} ଏବଂ ତାନ୍ତରକେ ମାନ୍ୟ କବଳୋ ଏହି
ତୋମାଦେଶ ଏଣ୍ଟ ତାବୋ ପାତାତି, ଏଣ୍ଟ କବା ଧୟ ତୋମାର ଏଣିକେ ନାହିଁ ଶାବଦେ^{୧୬}

ଥେବେ ପଦିତ ଏମବୁଦ୍ଧିନୋ ବାଚିକ ଏବଂ ଆମାତେବେ କହିଛି ଯଥେ କବଳୋ କିମ୍ବା ଏବଂ
ଶବ୍ଦଗୋ ପଢ଼େ ଏବଂ ଯେ କବଳେ ଧ୍ୟୋ କବା ବ୍ୟାପ ଭା ହିଁ, ଯା ଏହି ଧ୍ୟୋ ସବ୍ରଦ୍ଧି
କବଳେ ଏମେହି ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିବ୍ରତର ନିକଟିତେ ତାର ଧ୍ୟୋ ଯେ ଭାବରେ ହେବେ, ଏବଂ
କହିବାଦେଶ ଧ୍ୟୋ ଭା ନେଇ

୨୩. ଶୂରାର ପୁରାତେ ଯେମେ ବିଦ୍ୟାନ ଦେଖି କିମ୍ବା ମହାତ କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟା ଏ
ଅନାଚାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବେ କିମ୍ବା କାହାତେ ହେବେ ତା କାଳାବଳୀ ନା ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ
ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ହେବେ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଉତ୍ସର୍ଗର ଉତ୍ସର୍ଗର କୋଥା ଏବଂ
ଶାହୁଭିକ୍ଷ କର୍ମକାଳ ଏମନାବେ ଉତ୍ସର୍ଗନ ଯାତେ କବଳେ ଏମର ବିଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟା କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଏବଂ
ହେ ଧ୍ୟ ଏମର ବିଦ୍ୟାନ କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ କବଳେ ଧ୍ୟ ଏବଂ କବଳେ ଧ୍ୟ ଏବଂ
ନିତି ହେବେ :

ଏବଂ ; ଅନବାଦେଶ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରଶରର ଏ ବିଦ୍ୟାନ ବଧନ କବଳେ ପରିବ୍ରତର ଏବେ ଏହାହି ଏବଂ
କବଳେ ଯେ, କୁଣ୍ଡଳ ଧ୍ୟାର ନାହିଁ ମଧ୍ୟମ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିବ୍ରତର ବିଦ୍ୟାନ ଏତ କବଳେ ଏବଂ କବଳେ
ବିଦ୍ୟା ଅଶ୍ଵଦ୍ଧର ଏତାବେ ମଧ୍ୟମ ଏ କବଳେ ବାପକ ପରିବ୍ରତର ବିଦ୍ୟାନ ଏବଂ କବଳେ ଏବଂ
ଯୋନ କାମଳାତାତ୍ତ୍ଵିତ ପରିବେଶର ଉତ୍ସର୍ଗର ଧ୍ୟ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ କବଳେନ ଉତ୍ସର୍ଗର ଧ୍ୟ ଏବଂ ଏ
ଯୋନ କାମଳା ତାତ୍ତ୍ଵିତ ପରିବେଶକେ କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାନ ଏକାକ୍ରମ ଉତ୍ସର୍ଗ କିମ୍ବା ଯେ, କୋକଦେଶର
ପରଶରର ପୂର୍ବ ନିକଟକେ ଏମ ଧ୍ୟାର ଏବଂ କବଳେ ହେ, ପରିବ୍ରତିତ କାଳୀ-ଶୁଦ୍ଧଦେଶର
ପରଶର ଦେଖି ମଧ୍ୟମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାନାବେ କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାନ ଏବଂ କବଳେ ହେବେ, ମେଯୋଦେଶ
ଏହାହି ଅଭି ନିକଟ ପରିବେଶର କୋକ କାଳୀ କାମଳା ଶୁଦ୍ଧଦେଶ ଏହାହି ହିଁ ଏବଂ ଏବଂ
ଅପରିଚିତଦେଶ ମଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟମରେ କବଳେ ହେବେ, ପରିବ୍ରତାତ୍ତ୍ଵିତ ପରଶରର
ଚିରଭାବେ ଏବଂ କବଳେ ଦିତେ ହେବେ, ଶୁଦ୍ଧଦେଶର ଓ ନାନାଦେଶର ନାନାବାନ ଏହିହିସିତ ଧ୍ୟା ଯାବେ ନା
ଏମନକି କୋଶାଯ ଓ କୋଶରେତ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ହେବେ, ଏମା ଧ୍ୟାର କୋ ଏହି, ମେଯୋଦେଶ
ପରଶରହିନାବେ ଓ ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାନ କୋକରେ ଏହିହିସିତ ଧ୍ୟାର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁମୁଦ୍ରା
ଏମନ ମେନିକ କର୍ମକାଳର କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟମେ ମଧ୍ୟମରେ ଏହାହି ମଧ୍ୟମରେ
ଯୋନ କାମଳା ସର୍ବଦ୍ୱାର ଧାକେ ଏବଂ ଏ ଯୋନ କାମଳର ଶବ୍ଦତ୍ତୀ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାନ
ଚୋଥ, କାଳ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ମାନମ୍ ସବକିନ୍ତୁ କୋନ ବାତ୍ରେ କାଳନିକ କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାନ
(Scandal) ଘାଡ଼ିତ ହାର ଧେନା ମଧ୍ୟମରେ ତୈରି ଥାକେ । ଏ ଦୋଷ ଓ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟମରେ କରାଇ
ଧାନ୍ୟ ଆଶୋଚ୍ୟ ପରଦାର ବିଧିମୂଳର ଚେତେ ବେଶୀ ନିର୍ଭୂତ, ଉପଯୋଗୀ ଓ ଅଭାବକୀୟ ଅନ୍ୟ କୋନ ।

কর্মপথ আগ্রাহের জ্ঞান-ভাগোরে ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

দুই : এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আগ্রাহের শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিঙ্গ হতে উক্ষাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিচিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোগ্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিয়েখ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রূপে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোগ্তাই (Prosecutor) নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২৪. মূলে **شَدَّ** ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে **حَتْىٰ تِسْتَانِسْوَا** (অর্থাৎ যতক্ষণ না অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। **حَتْىٰ تِسْتَانِسْوَا** বললে আয়াতের অর্থ হতো : “কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি দিয়ে নাও।” এ প্রকাশ ভঙ্গী পরিহার করে আগ্রাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমাদের ভাষায় এর মানে হয় পরিচিতি, অস্তরণতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন **تِسْتَانِسْوَا** শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কि না জানা অথবা নিজের সাথে অস্তরণ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে : “লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অস্তরণ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।” অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে “অনুমতি নেবা”র পরিবর্তে ‘সম্মতি লাভ’ শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের নিকটতর।

২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা **حُبِّيْثِمْ مَسَاءً، حُبِّيْثِمْ صَبَاحًا**, (সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) বলতে বলতে নিসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বিরোগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আগ্রাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয় নয়। এ হকুমটি নাখিল হবার পর

নবী সাল্লাহুার আগাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন আমি নীচে সেগুলো বর্ণনা করিছি :

এক : নবী সাল্লাহুার আগাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উকি বুকি মারা, বাইর থেকে চেয়ে দেখা এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। হযরত সওবান (নবী সাল্লাহুার আগাইহি ওয়া সাল্লামের আঙাদ করা গোলাম) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেন :

إذا دخل البصر فلا انز

“দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার ঘন্য অনুমতি নেবার দরকার কি?” (আবু দাউদ)

হযরত হ্যাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাহুার আগাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার উপর দৌড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) তাকে বলেন, “مَكْذَا عَنِكَ ، فَإِنَّمَا الْأَسْتِيذَانَ مِنَ النَّظَرِ” পিছনে সরে গিয়ে দৌড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” (আবু দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দৌড়াতেন না। কারণ সে মুঁগে ঘৰের দরজায় পরদা ধটকানো থাকতো না। তিনি দরঘার ডান পাশে বা বাম পাশে দৌড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রসূলুল্লাহ (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূলের (সা) কামরার মধ্যে উকি দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) হাতে সে সহয় একটি তীর ছিপ। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে চুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন :

مَنْ نَظَرَ فِيْ كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظَرُ فِي النَّارِ

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগনের মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে।” (আবু দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উল্লিখ হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন :

لَوْ أَنْ امْرًا أَطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِ فَخَذَفْتَهُ بِحِصَّةِ فَفَقَاتَ عَلَيْهِ مَاكَانٌ

عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

“যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাঁতে কোন গোনাহ হবে না।”

এ বিষয়বস্তু সরলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

مَنِ اطْلَعَ دَارَ قُومٍ بِغَيْرِ اذْنِهِ فَفَقَوْا عَيْنَهُ مَفَدَدَتْ عَيْنَهُ

“যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেদ্দা করে দেয়,
তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।”

ইমাম শাফেট এ হাদীসটিকে একদম শাস্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ
ঘরের মধ্যে উকি দিলে তার চোখ ছেদ্দা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ
এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিষ্ক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি
এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে,
গৃহবাসীদের বাধা দেয়াও সে নির্ণয় হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে।
এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেদ্দা হয়ে যায় বা শরীরের কোন
অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন-জাসুসাস,
৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দুই : ফকীহগণ শব্দগতিকেও দৃষ্টিশক্তির হকুমের অন্তরভুক্ত করেছেন। যেমন অক্ষুণ্ণ
ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো
গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত
গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হওয়াক্ষেপ।

তিনি : কেবলমাত্র অন্যের পৃষ্ঠে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হকুম দেয়া হয়নি
বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার
সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হী। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর
কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব
দিলেন, “أَنْحَبْ أَنْ تَرَا هَا عَرِيَانَةَ” কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায়
দেখতে পছন্দ কর?” (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে
বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উকি হচ্ছে,
عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْنِنُوا عَلَىِّ أَمْهَاتِكُمْ وَأَخْوَاتِكُمْ”
নিজেদের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।”
(ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার
সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে,
হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকতেন তখনই আগেই এমন কোন
আওয়াজ করে দিতেন যাতে তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে
এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

চারি : শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ
কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য
দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

পাঁচ : প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম
কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে

এবং দরজা থেকে চিত্কার করে বলতে থাকে حٰل। (আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?) নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওয়াহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, ۹ (আসমালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ক্ষেপের ব্যাপারে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজার করারাত করলাম। তিনি জিজেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, “আমি? আমি?” অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ) কালাদাহ ইবনে হাশল নামে এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আস্মালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। ইয়রত উমরের (রা) ব্যাপারে বর্ণিত আছে, নবী করীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন :

السلام عليكم يارسول الله ايدخل عمر

“আস্মালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?” (আবু দাউদ)

অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জ্বার তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি ইয়রত সাঁদ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আস্মালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। ইয়রত সাঁদ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাঞ্চিল আপনার মুবারক কর্তৃ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নিচুৰুরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

ছয় : গৃহমণিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিষ্টে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

সাত : অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অথবা শীড়পীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অবীকৃতি জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত।

فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَافِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلْهَا حَتّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ
قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا هَوَازِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ^{১৬}
لَيْسَ عَلِيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بِيُوتَ الْمُسْكُونَةِ فِيمَا مَتَّاعُكُمْ
وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدِلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ^{১৭} قُلْ لِلّهِ مِنْ نِعْمَاتِ
مِنْ أَبْصَارِهِ وَيَحْفَظُوا فِيْرَوجَهُمْ ذَلِكَ آزِكَيْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ^{১৮}

তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।^{২৬} আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শান্তি ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি^{২৭} এবং যা কিছু তোমরা করো আগ্লাহ তা বুব তালোভাবেই জানেন। তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে^{২৮} তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আগ্লাহ সবই জানেন।

হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে^{২৯} এবং নিজেদের সজ্ঞাহানসমূহের হেফাজত করে।^{৩০} এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি, যা কিছু তারা করে আগ্লাহ তা জানেন।

২৬. অর্থাৎ কারোর শুন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয় নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলে আপনি আমার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার ঘরের পেছে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি, অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা তেতুর হেকে কেউ বসছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে তেতুরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়; কোন বাস্তি যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অধীক্ষার করার অধিকার আছে। অথবা কোন কাজে ব্যক্ত ধাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফর্কীহগণ (ফিরে যাও) এর হকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গৌট হয়ে

দৌড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দৌড়িয়ে তাকে বিরুদ্ধ করতে থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

২৮. এখানে মূলত হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে।

২৯. মূল শব্দগুলো হচ্ছে এখানে মানে হচ্ছে, কোন জিনিস কর করা, হাস করা ও নিচু করা। এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, “দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।” কিন্তু আসলে এ হকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিতে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। “দৃষ্টি সংযত রাখা” থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। এর মধ্যে মনে মনে (মিন) “কিন্তু” বা “কতক” অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হকুম দেয়া হয়নি বরং কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গন্তব্য মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। এখন পূর্বাপর আশেচনা থেকে জানা যায়, এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাহানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অঙ্গীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আল্লাহর কিতাবের এ হকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

এক : নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নামীদের ছাড়া কাউকে নজর করে দেখা মানুষের জন্য জায়েয় নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাহোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকরণীয় মনে হলে যেখানে আবার দৃষ্টিশাত করা ক্ষমাহোগ্য নয়। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে ঢোকের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন : মানুষ তার সমগ্র ইস্ত্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে ঢোকের যিনা, ফুসলানো কঠের যিনা, তৃতীয় সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যক্তিগুলোর এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাহানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরুদ্ধ থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) হয়রত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়রত আলীকে (রা) বলেন :

يَا عَلِيٌّ لَا تُتْبِعِ النُّظَرَةَ النَّظَرَةَ فَإِنْ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ

“হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।” (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, দারেমী)

হ্যরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজলী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নাখিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেছেন :

إِنَّ النُّظْرَسِهِمْ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسِ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلَهُ
إِيمَانًا يَجِدُ حَلَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ -

“দৃষ্টি হচ্ছে ইবনীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে যুক্তি আমাকে তয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে”। (তাবারানী)

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেন :

مَاءِمُ مُسْلِمٍ يَنْظَرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَغْضُبْ بَصَرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهَ
لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَوَتَهَا -

“যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের শুগর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ খাদ সৃষ্টি করে দেন।” (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম জাফর সাদেক তৌর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন : বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আবাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাঝে আরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তৌর উট্টের পিঠে বসেছিলেন। ফযল তাদেরকে দেখতে শাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের শুগর হাত রাখলেন এবং তাকে অনুদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস্তাম গোত্রের একজন মহিলা পথে রসূলুল্লাহকে (সা) ধামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজেস করছিলেন। ফযল ইবনে আবাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিয়ী, আবু দাউদ)

দুই : এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা দেকে রাখার হকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বৃদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বৃদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পরদা সাধারণভাবে পচাশিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পরদানশীল মহিলারও কখনো মুখ খোলার

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান মহিলারা পরদা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবহায় পরদার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিষ্ক দৃষ্টি সংবল করার হকুমটি মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা বেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভূল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাখিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পরদার প্রচলন করা হয়েছিল চেহারার পরদা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জঙ্গল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে ঝেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই শুমিরে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন।

فَعَرَفَنِيْ حِينَ رَأَيْتُ وَكَانَ قَدْ رَأَيْتُ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ
بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْتُ فَخَمَرْتُ وَجْهِيْ بِجَلْبَابِ -

তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পরদার হকুম নাখিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি ‘ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন’ পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।” (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উমে খালাদ নামী এক মহিলার ছেলে এক যুক্ত শহীদ হয়ে পিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেইশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি এক দম নিচিতে নিজেকে পরদাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো। জবাবে তিনি বলতে লাগলেন : আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উন্নত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক মহিলা পরদার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) জিজেস করেন, এটা মহিলার হাত না পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলাই হাত। বলেন, “নারীর হাত হলে তো কমপক্ষে নথ মেহেদী রঞ্জিত হতো।” আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করে এসেছি সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহুমামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেরেরা তিনু পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহুমাম বীধা অবস্থায় মকার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা ব্যবন

আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখ দেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম; (আবু দাউদ, অধ্যায় : মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম)

তিনি : যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হৃক্ষের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখাটা কমপক্ষে মূস্তাহাব তো অবশ্যই। মুগীরাহ ইবনে গু'বা বর্ণনা করেন, আমি এক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রসূলগুরু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেন :

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بینكما

“তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্তৃতা সৃষ্টি হওয়ার আশা আছে।” (আহমদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আবু হরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : **انظر اليها فان في اعين الانصار شيئاً** “মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চেয়ে কিছু দোষ থাকে।” (মুসলিম, নাসাই, আহমদ)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলগুরু (সা) বলেছেন :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يُرِي مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهِ فَلْيَفْعُلْ -

“তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সত্ত্ব তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আবৃষ্টি করে।” (আহমদ ও আবু দাউদ)

মুসলাদে আহমাদে আবু হয়েইদাহর বর্ণনা উদ্ভৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলগুরু (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে **فلا جناح علیه** শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাত এমনটি করায় স্ফতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজাত্তেও তাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ মেকেই ফকীহগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার বৈধতার বিধানও উত্তোলন করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে কোন সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কার্যীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের ঝুঁগিনীকে দেখা ইত্যাদি।

চার : দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَنْتَرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْدَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْتَرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْدَةِ الْمَرْأَةِ -

وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْصَن مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُ فِرَوْجَهُنَ
وَلَا يَبْدِلُنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيُفِرِّبَنْ بِخَمْرِهِنَ عَلَى
جِمَوْبِهِنَ

আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে^{৩১} এবং তাদের লজ্জাহানগুলোর হেফাজত করে^{৩২} আর^{৩৩} তাদের সাজসজ্জা না দেখায়,^{৩৪} যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে থায় তা ছাড়া।^{৩৫} আর তারা যেন তাদের উড়ন্টার ঔচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।^{৩৬}

“কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাহানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাহানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।” (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী)

হ্যরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেন :^{৩৭}
“الى فخذ حى ولا ميت”
(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৩০. লজ্জাহানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রত্যঙ্গির কামনা থেকে দূরে থাকা নয় বরং নিজের লজ্জাহানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুবায়। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাহানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন :
“পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাড়ী থেকে হাঁটু পর্যন্ত।” (দারুলকুত্বী ও বাইহাকী) শরীরের এ অংশ স্তৰী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারায়। আসহাবে সুরক্ষার দলভূক্ত হ্যরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বলেন :
“أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخْذَ عُورَةً؟”
“তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?”
(তিরমিয়ী, আবু দাউদ, মুআভা) হ্যরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :
“لَا تَبْرُزْ (بِالْتَّكْشِفِ) فَخَذْ شِنِيجِرَ الرَّانِ كَখনো খোলা রাখবে না।” (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)
কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন :

إِبَّاكُمْ وَالثُّعَرَىٰ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفَضِّي
الرُّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ -

“সাবধান, কখনো উলংগ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সন্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা),

তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা ঝীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়।
কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সশ্রান্ত করো।” (তিরমিয়ী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন :

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

”নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।”

فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ
এক ব্যক্তি জিজেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেন : “الله أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ” এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর বেশী হকদার।” (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ)।

৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে তিনি পুরুষদের দেখা উচিত নয়। তিনি পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। একদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাইছি যে, হ্যরত উমের সালামাহ ও হ্যরত উমের মাইমুনাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় হ্যরত ইবনে উমের মাকতুম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্ত্রীকে বললেন, “তার থেকে পরদা করো।” স্ত্রীরা বললেন :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا يَبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا

”হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না।” বললেন **الستمابتصران** : ”তোমরা দূজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছে না?” হ্যরত উমের সালামাহ (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, **إِنَّمَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِي** : “**ذَلِكَ بَعْدَ إِنْ أَمْرَ بِالْحِجَابِ**” এটা যখন পরদার হকুম নায়িল হ্যনি সে সময়কার ঘটনা। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী) এবং মুআস্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে : হ্যরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পরদা করলেন। বলা হলো, আগনি এর থেকে পরদা করছেন কেন? **لَكِنْ نَظِر** : **إِلَيْهِ** “**কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি!**” অন্যদিকে আমরা হ্যরত আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চতুরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হ্যরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিনি তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, উমের শরীর আনসারীয়ার কাছে থাকো। তাঁরপর বললেন, তাঁর কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশী যাওয়া আশা করে কোরণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীল মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী

করতেন।) কাজেই তুমি ইবনে উষ্মে মাকতুমের ওখানে থাকো। সে অঙ্গ। তুমি তার ওখানে নিসংকোচে থাকতে পারবে।” (মুসলিম ও আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা একক্ষণ করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের ওপর তেমন বেশী কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোয়ুমি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোন কোন জায়েয় খেলা দেখতে শিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোন হথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম গায়বানী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদিসগুলো থেকে প্রায় এ একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি উন্নত করেছেন যে, “এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ হকুম দেয়া হয়নি যে, তোমাও নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হকুমের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।” (৬ষ্ঠ বৃত্ত, ১০১ পৃষ্ঠা) তবুও মেয়েরা নিশ্চিষ্টে পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনোক্রমেই জায়েয় নয়।

৩২. অর্থাৎ অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্নত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য আবার তিনি তিনি।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ এমন কি বাপ ও তাইয়ের সামনেও তা খেলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোষ্ট পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কঠামো তের থেকে ফুটে উঠতে থাকে। হ্যরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তাঁর বোন হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাতলা কাপড় পরে ছিলেন। রসূলগ্রাহ (সা) সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন :

يَا أَسْمَاءُ ابْنَى الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا
وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ -

“হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয় নয়।” (আবু দাউদ)

এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর হ্যরত আয়েশা থেকে উন্নত করেছেন : তাঁর কাছে তাঁর বৈপিত্র্যে তাই আবদুল্লাহ ইবনুত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। হ্যরত আয়েশা বলেন, হে আল্লাহর রসূল!

إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلْ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْأَوْجَهَهَا وَالْأُمَّا بِوْنَ هَذَا وَقْبَضَنَ
عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ وَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفَ مِثْلَ قَبْضَةِ أُخْرَى -

“মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কজির ওপর হাত বেরে হাতের সীমানা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র এক মুঠি পরিমাণ জায়গা থাকে।”

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মায়দের (ফেমন বাগ-ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরের কেবলমাত্র ততটুকু অংশই ঝুলতে পারে। যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আঙ্গিন গুটানো অথবা ঘরের মেঝে ধূয়ে ফেলার সময় পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া।

আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের সতরের সীমারেখার মতই। অর্থাৎ নাড়ি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্থ উলংঘ থাকবে। বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাড়ি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়।

৩৩. এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়াত নারীদের কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই দাবী করে না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং সজ্ঞাহানের হেফাজত করা। বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু দাবী করে। এ দাবী পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয়।

৩৪. আমি রিন্ট শব্দের অনুবাদ করেছি “সাজসজ্জা”। এর দ্বিতীয় আর একটি অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড়, অলংকার এবং মাখা, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য “মেকআপ” (Makeup) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে আসছে।

৩৫. তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট করে তুলেছে। অন্যথায় কথাটি মোটেই অস্পষ্ট নয়, একেবারেই পরিষ্কার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে “অর্থাৎ তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে।” আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে “যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।” এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোন আতঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত (যেমন ওপরে যে

চাদরটি জড়ানো থাকে, কারণ কোনক্রিমেই তাকে শুকানো তো সম্ভব নয় আর নাগীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও ব্রতফূর্তভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন ইহরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরান ও ইবরাহীম নাখ্ত। পক্ষতরে কোন কোন মুফাসির মাঝের মধ্যে প্রকাশ করে আল্লাহর উপরে আর নিয়েছেন : **مَا يَظْهِرُ مِنْهَا** (মানুষ হাতাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়) এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সম্ভত সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রঞ্জ পাউডার, টোটে লিপস্টিক ও চোখে সুরমা দাগিয়ে এবং হাতে আর্টি, চূড়ি ও কঁকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে শোকদের সামনে ঢাকফেরা করবে। ইবনে আবুস (রা) ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৮-৩৮৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু আরবী ভাষার কোন নিয়মে “প্রকাশ হওয়া” ও “প্রকাশ করার” মধ্যে সুল্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে “প্রকাশ করা” থেকে বিরত রেখে “প্রকাশ হওয়া”র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে “প্রকাশ করা” পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হকুম এসে যাবার পর মহিলারা মুখ খুলে ঢলতো না, হিজাবের হকুমের মধ্যে চেহারার পরদাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিশ্যবকর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থ সতর ও হিজাবের মধ্যে যদীন আসমান ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয় নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নাগীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

৩৬. জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসৌট বৈধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খৌপার সাথে এর গিরো বীধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অল্প খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের উপরের দিকের অংশটি পরিকার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খৌপা দেখা যেতো। (তাফসীরে কাশশাফ, ২য় খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াত নাগীল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে উড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার যেয়েদের মতো তাকে ভৌজ করে পেটিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে ইহরত আয়েশা (রা) তার প্রশংসা করে বলেন : সূরা নূর নামিল হলে রসূলুল্লাহ আলাইহি শুয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শুনে শোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। আনসারদের যেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে **وَلَيَضْرِبُنَّ بِخُمُرٍ مِّنْ عَلَى جَبَرِيلِهِنَّ**

وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتِهِنَّ إِلَّا لِبَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبَاءَ بَعْوَلَتِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيِّ إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِيِّ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَالَكَتْ أَيْمَانِهِنَّ أَوِ التَّبِعِينَ
 غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عُورَتِ
 النِّسَاءِ مَوْلَأِ يَصْرِبِنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتَوْبَوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفَلَّحُونَ ⑦

তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিজেদের সামনে ছাড়ি^{৩৭}
 স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ,^{৩৮} নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,^{৩৯} তাই,^{৪০} ভাইয়ের
 ছেলে,^{৪১} বোনের ছেলে,^{৪২} নিজের মেলামেশার মেয়েদের,^{৪৩} নিজের
 মালিকানাধীনদের,^{৪৪} অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই^{৪৫}
 এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো
 অজ্ঞ,^{৪৬} তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের
 সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।^{৪৭}

হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আগ্রাহ কাহে তাওবা করো,^{৪৮} আশা
 করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।^{৪৯}

পর নিজের জ্যায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দৌড়িয়েছিল। অনেকে নিজের
 কোমরে বৈধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে
 ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামায়ের সময় যতগুলো
 মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাটা ও ওড়না পরা ছিল। এ
 সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে হ্যরত আয়েশা (রা) আরো কিঞ্চিরিত বর্ণনা করে বলেন :
 মহিলারা পাত্লা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মেটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে
 ওড়না তৈরী করে। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)

ওড়না পাত্লা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে
 চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই আনসারদের মহিলারা
 হকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরী করলে এ উদ্দেশ্য
 পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র
 লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে

দিয়েছেন। দেহইয়াহ কাল্বী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মিসরের তৈরী সূক্ষ্ম মণ্ডল (কাবাতী) এলো। তিনি তা থেকে একটুকরা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এখান থেকে কেটে এক খণ্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরী করে নাও এবং এক অংশ দিয়ে তোমার শ্রীর দোপাটো বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে **تَجْعَلُ تَحْتَهُ تُوبَةً لِّيَصْفِهَا** এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীরের গঠন তের থেকে দেখা না যায়।” (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)।

৩৭. অর্থাৎ যাদের মধ্যে একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই থাক না কেন কোন নারীর তার সামনে সাজসজ্জা করে আসা বৈধ নয়। **وَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبَدِّلُنَّ رِزْنَتَهُنَّ** এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছে তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য।

৩৮. মূলে **ءَابِ**। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয় বরং দাদা ও দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তরভুক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ ও শুভরের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার বাড়ির এসব মূরব্বীদের সামনেও।

৩৯. ছেলের অন্তরভুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের স্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন নিজের স্তানদের ও স্তানদের স্তানদের সামনে করতে পারে।

৪০. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল।

৪১. ভাইবোনদের ছেলে বলতে তিনি ধরনের ভাই বোনদের স্তান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তরভুক্ত।

৪২. এখানে যেহেতু আত্মীয়দের গোষ্ঠী ব্যতম হয়ে যাচ্ছে তাই সামনের দিকে অনাত্মীয় লোকদের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনটি বিষয় তালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এ বিষয়গুলো না বুঝলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র এমন সব আত্মীয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করেন যাদের নাম এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে। বাকি সবাইকে এমনকি আপন চাচা ও আপন মামাকেও যেসব আত্মীয়দের থেকে পরদা করতে হবে তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এদের নাম কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু একথা সঠিক নয়। আপন চাচা ও মামা তো দূরের কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো দুধ চাচা ও দুধ মামা থেকেও পরদা করতে হ্যরত আয়েশাকে অনুমতি

দেননি। সিহাহেসিভা ও মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে : আবুল কু'আইসের ভাই আফ্লাহ তাঁর কাছে এগেন এবং তেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। যেহেতু তখন পরদার হকুম নাফিল হয়ে গিয়েছিল, তাই হ্যরত আয়েশা অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, তুমি তো আমার ভাইয়ি, কারণ তুমি আমার ভাই আবুল কু'আইসের স্ত্রীর দুখপান করেছো। কিন্তু এ সম্পর্কটা কি এমন পর্যায়ের যেখানে পরদা উঠিয়ে দেয়া জায়েয় এ ব্যাপারে হ্যরত আয়েশা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেলেন। তিনি বললেন, সে তোমার কাছে আসতে পারে। এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ আয়াতকে এ অর্থে নেননি যে, এর মধ্যে যেসব আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে কেবল তাদের থেকে পরদা করা হবে না এবং বাকি সবার থেকে পরদা করা হবে। বরং তিনি এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব আত্মীয়ের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হকুমের অন্তরভুক্ত। যেমন চাচা, মামা, জামাতা ও দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। তাবে'ঈদের মধ্যে হ্যরত হাসান বসরীও এ মত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লামা আবু বকর জাসুসাস আহকামুল কুরআনে এর প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। (ওয় খও, ৩১০ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের সাথে চিরস্তন হারামের সম্পর্ক নয় (অর্থাৎ যাদের সাথে একজন কুমারী বা বিধবার বিয়ে বৈধ) তারা মুহাররাম আত্মীয়দের অন্তরভুক্ত নয়। মেয়েরা নিসৎকোচে সাজসজ্জা করে তাদের সামনে আসবে না। আবার একেবারে অনাত্মীয় অপরিচিতদের মতো তাদের থেকে তেমনি পূর্ণ পরদাও করবে না যেমন তিনি পুরুষদের থেকে করে। এ দুই প্রাতিকতার মাঝামাঝি কি দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। কারণ এটা নির্ধারিত হতে পারে না। এর সীমানা বিভিন্ন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়তা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক ও স্বৰূপ এবং উভয়পক্ষের অবস্থার (যেমন এক গৃহে বা আলাদা আলাদা বাস করা) প্রেক্ষিতে অবশ্যি বিভিন্ন হবে এবং হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি যা কিছু ছিল তা থেকে আমরা এ দিকনির্দেশনাই পাই। হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিক। বহু হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি রস্লের (সা) সামনে আসতেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কমপক্ষে চেহারা ও হাতের ক্ষেত্রে কোন পরদা ছিল না। বিদায় হচ্ছ অনুষ্ঠিত হয় নবীর (সা) ইতিকালের মাত্র কয়েক মাস আগে এবং সে সময়ও এ অবস্থাই বিরাজিত ছিল (দেখুন আবু দাউদ, হচ্ছ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মুহাররাম তার গোলামকে আদব শিক্ষা দেবে)। অনুরূপভাবে হ্যরত উমেহানী ছিলেন আবু তালেবের মেঘে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত বোন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সা) সামনে আসতেন এবং কমপক্ষে তাঁর সামনে কখনো নিজের মুখ ও চেহারার পরদা করেননি। যুক্তি বিজয়ের সময়ের একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন। এ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (দেখুন আবু দাউদ, কিতাবুস সওম, বাবুন ফীন নীয়াত ফিস সওমে ওয়ার রুব্বসাতে কুকীহ।) অন্যদিকে আমরা দেখি, হ্যরত আবুস তার ছেলে ফয়লকে এবং রাবী'আহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই) তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে নবী

০" সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে পাঠলেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়ে গেছো, তোমরা রোজগাত্রের ব্যবহা করতে না পারলে তোমাদের বিয়ে হতে পারে না, কাজেই তোমরা রসূলের (সা) কাছে গিয়ে কোন চাকরির দরখাস্ত করো। তারা দু'জন হয়রত যমনবের গৃহে গিয়ে রসূল্লাহর বিদমতে হাযির হলেন। হয়রত যমনব ছিলেন ফখলের আপন কুপাত বোন আর আবদুল মুজালিব ইবনে রাবী'আর বাপের সাথেও তাঁর ফখলের সাথে যেমন তেমনি আতীয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দু'জনের সামনে হাযির হলেন না এবং রসূলের (সা) উপস্থিতিতে পরদার পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ) এ দু'ধরনের ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে উপরে আমি যা বর্ণনা করে এসেছি বিষয়টির সে চেহারাই বোধগ্য হবে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেখানে আতীয়তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে মুহাররাম আতীয়দের থেকেও সতর্কতা হিসেবে পরদা করা উচিত। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে উচ্চত হয়েছে, উস্বুল মু'মিনীন হয়রত সওদার (রা) এক ভাই ছিল বাদিপুত্র (অর্থাৎ তাঁর পিতার ক্রীতদাসীর গর্তজাত ছিল)। তাঁর সম্পর্কে হয়রত সা'দ ইবনে আবী উয়াকাসকে (রা) তাঁর ভাই উত্তুবা এ মর্মে অসীমাত করেন যে, এ ছেলেকে নিজের ভাতিজা মনে করে তাঁর অভিভাবকত্ব করবে কারণ সে আসলে আমার উরসজ্ঞাত। এ মাফলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি হয়রত সা'দের দাবী এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, "যার বিছানায় স্তানের জন্য হয়েছে সে-ই স্তানের পিতা। আর ব্যতিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।" কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হয়রত সওদাকে বলে দিলেন, এ ছেলেটি থেকে পরদা করবে কারণ সে যে সত্যিই তাঁর ভাই এ ব্যাপারে নিসদ্দেহ হওয়া যায়নি।

৪৩. مُلْئِنَ نَسَانْ شَدْ بَيْبَانْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাদিক অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের মহিলারা" এখানে কোন মহিলাদের কথা বলা হয়েছে সে বিতর্কে পরে আসা যাবে। এখন সবার আগে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য এবং যেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, এখানে নিচেক "মহিলারা" (النساء) বলা হয়নি, যার ফলে মুসলমান মহিলার জন্য সমস্ত মহিলাদের এবং সব ধরনের মেয়েদের সামনে বেপরদা হওয়া ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়েয় হয়ে যেতো। বরং نَسَانْ-নَسَانْ বলে মহিলাদের সাথে তাঁর বাধীনতাকে সর্বাবহৃত্য একটি বিশেষ গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সে গভীর যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। এখন থগ্র থেকে যায়, এটা কোন গভীর এবং সে মহিলারাই বা কারা যাদের উপর نَسَانْ-নَسَانْ শব্দ প্রযুক্ত হয়? এর জবাব হচ্ছে, এ ব্যাপারে ফর্কীহ ও মুফাস্সিরগণের উচ্চি বিভিন্ন :

একটি দল বলেন, এখানে কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। যিহী বা অন্য যে কোন ধরনের অমুসলিম মেয়েরাই হোক না কেন মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের থেকে পুরুষদের থেকে যেমন করা হয় তেমনি পরদা করা উচিত। ইবনে আবাস, মুজাহিদ ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন। এরা নিজেদের সমর্থনে এ ঘটনাটিও পেশ করে থাকেন যে, হয়রত উমর (রা) হয়রত আবু উবাইদাহকে লেখেন, "আমি শুনেছি কিছু মুসলিম নারী অমুসলিম নারীদের সাথে হাস্মামে যাওয়া শুরু করেছে। অথচ যে নারী আল্লাহ ও আবেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাঁর জন্য তাঁর শরীরের উপর তাঁর মিল্লাতের অন্তরভুক্তদের

ছাড়া অন্য কারোর দৃষ্টি পড়া হাজল নয়।^{১০} এ পত্র যখন হয়েরত আবু উবাইদাহ পান তখন তিনি হঠাৎ ভীত হয়ে দৌড়িয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, “হে আল্লাহ! যেসব মুসলমান মহিলা নিছক ফর্সা হবার জন্য এসব হাত্মামে যায় তাদের মুখ যেন আধেরাতে কালো হয়ে যায়।” (ইবনে জারীর, বায়হাকী ও ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় দলটি বলেন, এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম রায়ীর দৃষ্টিতে এ মতটিই সঠিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, যদি সভিই আল্লাহর উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে তাহলে আবার ন্সামন نساء ممن বলার অর্থ কি? এ অবস্থায় তো শধু **النساء** বলা উচিত ছিল।

তৃতীয় মতটিই যুক্তিসংগত এবং কুরআনের শব্দের নিকটতরও। সেটি হচ্ছে, যেসব নারীদের সাথে তারা মেলামেশা করে, যাদের সাথে তাদের জানাশোনা আছে, যাদের সাথে তারা সম্পর্ক রাখে এবং যারা তাদের কাজে কর্মে অংশ নেয় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের ক্ষতাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক এবং যারা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে এ গণীয় বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সহীহ হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কাছে যিন্মী মহিলাদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে আসল জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে সেটি ধর্মীয় বিভিন্নতা নয় বরং নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য পরিবারের স্ত্রী, মুজ্জাহিদা ও সদাচারী মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলারা পুরোপুরি নিসংকোচে মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরাও যদি বেহায়া, বেপরদা ও অসদাচারী হয় তাহলে প্রত্যেক শরীফ ও ভদ্র পরিবারের মহিলার তাদের থেকে পরদা করা উচিত। কারণ নৈতিকতার জন্য তাদের সাহচর্য তিনি পুরুষদের সাহচর্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর নয়। আর অপরিচিত মহিলারা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে মেলামেশা করার সীমানা আমাদের মতে গায়ের মুহাররাম আত্মীয়দের সামনে স্বাধীনতাবে চলাফেরা করার সর্বাধিক সীমানার সম্পরিমাণ হতে পারে। অর্থাৎ তাদের সামনে মহিলারা কেবলমাত্র মুখ ও হাত খুলতে পারে, বাকি সারা শরীর ও অংগসম্ভা ঢেকে রাখতে হবে।

৪৪. এ নির্দেশটির অর্থ বুঝার ব্যাপারেও ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। একটি দল এর অর্থ করেছেন এমন সব বৌদ্ধী যারা কোন মহিলার মালিকানাধীন আছে। তাদের মতে, আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে, বৌদ্ধী মূল্যরিক বা আহলি কিতাব যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন মুসলিম মহিলা মালিক তার সামনে তো সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু মহিলার নিজেরই মালিকানাধীন গোলামের থেকেও পরদা করার ব্যাপারটি অপরিচিত স্বাধীন পুরুষের থেকে পরদার সম্পর্কায়ের। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মুজ্জাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে মুসাইইব, তাউস ও ইমাম আবু হানীফার মত। ইমাম শাফেক্স'র একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। এ মনীধীদের যুক্তি হচ্ছে, গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে তার আগের মহিলা মালিককে বিয়েও করতে পারে। কাজেই নিছক গোলামী এমন কোন কারণ হতে পারে না যার ফলে মহিলারা তাদের সামনে এমন স্বাধীনতাবে

চলাফেরা করবে যার অনুমতি মুহাররাম পুরুষদের সামনে চলাফেরা করার জন্য দেয়া হয়েছে। এখন বাকী থাকে এ প্রশ্নটি যে, **مَا مَلْكُتْ أَيْمَانِهِنَّ** শব্দাবলী ব্যাপক অর্থবোধক, গোলাম ও বাঁদী উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আবার বিশেষভাবে বাঁদীদের জন্য একে ব্যবহার করার যুক্তি কি? এর জবাব তারা এভাবে দেন যে, এ **شَدَّادَبَلِيٌّ** যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তবুও পরিবেশ ও পরিস্থিতি এগুলোর অর্থকে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করছে। প্রথমে **نَسَاءُهُنَّ** বলা হয় তারপর বলা হয় **مَالِكُتْ أَيْمَانِهِنَّ** প্রথমে **نَسَاءُهُنَّ** শব্দ শুনে সার্ধারণ র্মানুষ মনে করতে পারতো এখানে এমন নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন নারীর পরিচিত মহলের বা আজীয়-স্বজনদের অন্তরভুক্ত হবে। এ থেকে হয়তো বাঁদীরা এর অন্তরভুক্ত নয়, এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই **مَا مَلْكُتْ أَيْمَانِهِنَّ** বলে দিয়ে একথা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাধীন মেয়েদের মতো বাঁদীদের সামনেও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দলের মতে এ অনুমতিতে বাঁদী ও গোলাম উভয়ই রয়েছে। এটি হ্যরত আয়েশা (রা) ও হ্যরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতিপয় আহলে বায়েত ইমামের অভিযত। ইমাম শাফে'ঈর একটি বিখ্যাত উক্তিও এর সপর্কে রয়েছে। তাদের যুক্তি শুধুমাত্র **مَالِكُتْ أَيْمَانِهِنَّ** এর ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তারা সুন্নাতে রসূল খেকেও এর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন এ ঘটনাটি : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাস্তানাতিল ফায়ারী নামক এক গোলামকে নিয়ে হ্যরত ফাতেমার বাড়িতে গেলেন। তিনি সে সময় এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যেতো এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হতবিহবল ভাব দেখে বললেন, **لَبِسْ عَلَيْكَ بَاسَ انْمَاءً هُوَابُوكَ وَغَلَامَكَ** “কোন দোষ নেই, এখানে আছে তোমার বাপ ও তোমার গোলাম।” (আবু দাউদ, আহমদ ও বায়হাকী আনাস ইবনে মালোকের উন্নতি থেকে। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত ফাতেমাকে এ গোলামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একে লালন পালন করেছিলেন এবং তারপর মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ উপকারের প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছিল যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় হ্যরত আলীর প্রতি চরম শক্রতার প্রকাশ ঘটিয়ে আলীর মু'আবিয়ার একাত্ত সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।) অনুরূপভাবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি থেকেও যুক্তি প্রদর্শন করেন—

إذا كان لاحد اكن مكاتب وكان له ما يودى فلتتحجب منه

“যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে “মুকাতাবাত” তথা অর্থ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং সে চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করার ক্ষমতা রাখে তখন তার সে গোলাম থেকে পরদা করা উচিত।” (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী এবং ইবনে মাজাহ উম্মে সালামার রেওয়ায়াত থেকে)

৪৫. مُلْكُ التَّابِعِينَ غَيْرُ اولى الْأَرْبَعَةِ مِنَ الرِّجَالِ شব্দাবলী বলা হয়েছে। এর শান্তিক অনুবাদ হবে, “পুরুষদের মধ্য থেকে এমন সব পুরুষ যারা অনুগত, কামনা রাখে

না।” এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে একজন মুসলমান মহিলা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে, যখন তার মধ্যে দৃষ্টি গুণ পাওয়া যায়, এক, সে অনুগত অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই, তার মধ্যে কামনা নেই। অর্থাৎ নিজের বয়স, শারীরিক অসামর্থ, বৃক্ষবৃত্তিক দুর্বলতা, দারিদ্র্য ও অর্ধহীনতা অথবা অন্যের পদান্ত হওয়া ও গোলামীর কারণে তার মনে গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন বা মা সম্পর্কে কোন কুসংকল্প সৃষ্টি হবার শক্তি বা সাহস থাকে না। এ হৃকুমকে যে ব্যক্তিই নাফরমানীর অবকাশ অনুসন্ধানের নিয়েতে নয় বরং আনুগত্য করার নিয়েতে পড়বে সে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করবে যে, আজকালকার বেয়ারা, খানসামা, শোফার ও অন্যান্য যুবক কর্মচারীরা অবশ্যি এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। মুফাস্সির ও ফকীহগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ওপর একবার নজর বুলালে জানী ও বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দগুলোর কি অর্থ বুবেছেন তা জানা যেতে পারে :

ইবনে আব্বাস : এর অর্থ হচ্ছে এমন সব সাদাসিধে বোকা ধরনের লোক যারা মহিলাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

কাতাদাহ : এমন পদান্ত ব্যক্তি যে নিজের পেটের খাবার যোগাবার জন্য তোমার পেছনে পড়ে থাকে।

মুজাহিদ : এমন লোক যে ভাত চায়, মেয়েলোক চায় না। থাকে।

শা'বী : যে ব্যক্তি গৃহকর্তার অনুগত তার পদান্ত এবং যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি তাকাবার হিস্ত নেই।

ইবনে যায়েদ : যে ব্যক্তি কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকে। এমনকি তাদের ঘরের লোকে পরিণত হয় এবং সে পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়। ঘরের মেয়েদের প্রতি সে নজর দেয় না এবং এ ধরনের নজর দেবার হিস্তই করতে পারে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সে তাদের সাথে লেগে থাকে।

তাউস ও যুহুরী : নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি উৎসাহ নেই এবং এর হিস্তও নেই।

(ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা এবং ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাখ্যাগুলোর চাইতেও বেশী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এটি ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়। বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, নাসাই ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদিসগণ এটি হ্যরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামাহ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে : মদীনা তাইয়েবায় ছিল এক নপুঁশক হিজড়ে। নবীর পরিত্র স্ত্রীগণ ও অন্য মহিলারা তাকে এর মধ্যে গণ্য করে নিজেদের কাছে আসতে দিতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চুল মু'য়মিনীন হ্যরত উম্মে সালামাহর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে উম্মে সালামাহ (রা) তাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে কথা বলতে শুনলেন। সে বলছিল, কাল যদি তায়েফ জয় হয়ে যায়, তাহলে আপনি গাইলান সাকাফির মেয়ে বাদীয়াকে না নিয়ে

ক্ষমতা হবেন না। তারপর সে বাসীয়ার সৌন্দর্য ও তার দেহ সৌচিত্রের প্রশংসনা করতে থাকলো এমনকি তার পোপন অঙ্গসমূহের প্রশংসামূলক বর্ণনাও দিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বলেন, “ওরে আল্লাহর দুশ্মন। তুই তো তাকে খুবই ধূঢ় করে দেখেছিস বলে মনে হয়।” তারপর তিনি হকুম দিলেন, তার সাথে পরদা করো এবং ভবিষ্যতে যেন সে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর তিনি তাকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন এবং অন্যান্য নপুংশক পুরুষদেরকেও অন্যের গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কারণ তাদেরকে নপুংশক মনে করে মেয়েরা তাদের সামনে সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং তারা এক ঘরের মেয়েদের অবস্থা অন্য ঘরের পুরুষদের কাছে বর্ণনা করতো। এ থেকে জানা যায়, কারো **غَيْرُ أَوْلَى الْأَرْبَعَةِ** (কামনাহীন) হবার অন্য ক্ষেবনমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সে শারীরিক দিক দিয়ে ব্যাচিতা করতে সমর্থ নয় যদি তার মধ্যে প্রচুর যৌন কামনা থেকে থাকে এবং সে মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহভিত্তি হয় তাহলে অবশ্য সে অনেক রকমের বিপদের কারণ হতে পারে।

৪৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনো যৌন কামনা সৃষ্টি হয়নি। বড় জোর দশ-বারো বছরের ছেন্দের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে। এর বেশী বয়সের ছেন্দের অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাদের মধ্যে যৌন কামনার উল্লেখ হতে থাকে।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হকুমটিকে কেবলমাত্র অংকোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি হাড়া অন্যান্য ইন্সিগ্নিয়েটোরকে উত্তেজিতকারী ছিনিসগুলোও আল্লাহর তা'আদা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাধসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই তিনি মহিলাদেরকে খোশবু শাগিয়ে বাইরে বের না হবার হকুম দিয়েছেন। হ্যাতত আবু হুরাইরা (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন :

لَا تَمْنَعُوا أَمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لَيَخْرُجُنَّ وَمَنْ تَفَلَّتْ

“আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু শাগিয়ে না আসে।” (আবু দাউদ ও আহমাদ)

একই বক্তব্য সবচিত অন্য একটি হাসীসে বলা হয়েছে, একটি যেয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। হ্যাতত আবু হুরাইরা (রা) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলেন। তিনি অনুভব করলেন মেয়েটি খোশবু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজেস করলেন, “হে মধুপরাক্রমশালী! আল্লাহর দাসী। তুম কি মসজিদ থেকে আসছো?” সে বললো হী। বললেন, “আমি আমার প্রিয় আবুণ কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার নামায ততক্ষণ করুণ হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, নাসাঈ)। আবু মুসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

**إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا
فَالْقَوْلُ شَدِيدٌ** -

”যে নারী আতর মেথে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।” (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশবু ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রগাঢ় কিন্তু সুবাস হাল্কা। (আবু দাউদ)।

অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্তুগণ নিজেরাই লোকদেরকে দীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে ঘটিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ন পুরুষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভূলে যান তাহলে পুরুষদের সুবহানাল্লাহ বলার হ্রফুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের ওপর অন্য এক হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجٰلِ وَالْتَّصْبِيْقُ لِلنِّسَاءِ)

৪৮. অর্থাৎ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যেসব ভুল-ভাস্তি তোমরা করেছো তা থেকে তাওবা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও।

৪৯. প্রসংগত এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারণও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছি :

এক : মুহাররাম আতীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আতীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন :

لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغَيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدُّم

”যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।” (তিরমিয়ী)

হ্যরত জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِاِمْرأَةٍ لَّيْسَ مَعْهَا
ذُوْمَحْرِمٍ مِنْهَا فَإِنَّ شَائِلَهُمَا الشَّيْطَانَ -

”যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ইমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।” (আহমাদ)

প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সর্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ভৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা) নিজের সতর্কতা এমন

পর্যায়ে পৌছেছিল যে, একবার রাতের বেলা তিনি হযরত সাফিয়ার সাথে তাঁর গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহান্নাব্বাহ। হে আল্লাহর রসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোন কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান মানুষের মধ্যে রজের মতো চলাচল করে। আমার আশংকা হলো সে আবার তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)।

দুই : কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের আই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন তিনি মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।” (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)।

তিনি : তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আবাসের রেওয়ায়াত উন্নত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) খুতবায় বলেন :

لَا يَخْلُفُنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا نُوْمَحْرِمٌ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي
مَحْرِمٍ -

“কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একাত্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মুহাররাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে।”

এক বাস্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হচ্ছে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, فانطلق فحج مع امرأتك “বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হচ্ছে চলে যাও।” এ বিষয়বস্তু সংবলিত বহু হাদীস ইবনে উমর, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়ুল্লাহ আনহুম থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ ও আবোরাতে বিশালী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফরের উপর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনটিতে একদিন, কোনটিতে এক দিন এক রাত, কোনটিতে দু'দিন আবার কোনটিতে তিনি দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ব্যতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। কারণ এ বিভিন্নতার একটি বৃক্ষিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ঘটনার যেমন যেমন অবস্থা রসূলের (সা) সামনে এসেছে সে অনুযায়ী তিনি তার হৃক্ষ

বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন মহিলা যাজ্ঞেন তিনি দিনের দূরত্বের সফরে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের সফরে যাজ্ঞেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আবাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোন মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ ধরনের সফর করা উচিত নয়।

চারঃ ৪ রসূলগুলাহ (সা) মৌখিকভাবে এবং কার্যতও নারী ও পুরুষের মেলামেশা রোধ করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোন ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুম'আকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ খেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায পড়ে নেয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি অনুযায়ী তার নামায গৃহীতই হয় না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুলকুত্বনী ও হাকেম ইবনে আবাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামায ফরয হওয়া খেকে মেয়েদেরকে বাদ দেয়েছেন। (আবু দাউদ উক্তি আভায়ার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দারুলকুত্বনী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবু দাউদ ও হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে শরীক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনইনি। বরং এর অনুমতি দিয়েছেন এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এ সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। ইবনে উমর (রা) ও আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ “আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।” (আবু দাউদ) অন্য রেওয়ায়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে উমর খেকে নিরোক্ত শব্দাবলী এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দাবলী সহকারে :

أَذِنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيلِ

“মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে আসার অনুমতি দাও।” (বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসাই, আবু দাউদ)

অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলী হচ্ছে :

لَا تَمْنَعُو نِسَائِكُ الْمَسَاجِدِ وَبِيَوْتِهِنَ خَيْرٌ لَهُنَ

“তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য ভালো।” (আহমাদ, আবু দাউদ)

উক্ত ইমাইদ সায়েন্দীয়া বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, “তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসজিদে

”নামায পড়ার চাইতে ভালো এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো।” (আহমদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট হাদীস আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হয়রত উম্মে সালামার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দাবলী হচ্ছে : خير مساجد النساء قصر بيوتهن : “মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ।” (আহমদ, তাবারানী) কিন্তু হয়রত আয়েশা (রা) বনী উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, “যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন যেমনভাবে বনী ইসরাইলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হয়রত উমর (রা) নিজের শাসনামলে এ দরজা দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ইতিখালুন নিসা ফিল মাসজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা’আতে মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরার পর কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে চলে যেতে পারে। (আহমদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোক্তৃত লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্টতম লাইনটি হচ্ছে সবার পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী) লাইনটি। আর মহিলাদের সর্বোক্তৃত লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের (অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাদি ও আহমদ) দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুষদের থেকে দূরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে গিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে সর্বোধন করতেন। (আবু দাউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনার মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আবাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর বাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, পথে নারী-পুরুষ এক সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন,

إِسْتَأْخِرْنَ فِإِنْ لَيْسَ لَكُنْ أَنْ تَحْتَضِنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنْ بِحَافَاتِ
الطَّرِيقِ -

”থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো।” এ কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একেবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। (আবু দাউদ)

এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী-পুরুষের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের প্রকৃতির সাথে কত বেশী বেখাল্লা। যে দীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় গোষ্ঠীকে পরম্পর মিথিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে ক্লু-কলেজ, অফিস-আদালত, ক্লাব-রেস্তোরাঁ ও সভা-সমিতিতে তাদের মিথিত হওয়াকে বৈধ করে দেবে?

পাঁচ : নারীদেরকে তারসাম্য সহকারে সাজসজ্জা করার তিনি কেবল অনুমতিই দেননি বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ বাপারে সীমা অতিক্রম করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোকে তিনি অভিসম্পাতযোগ্য এবং মানব জাতির ধূসের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন :

- ০ নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশী লঘা ও চল দেখাবার চেষ্টা করা।
- ০ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উলকি আকা ও কৃত্রিম তিল বসানো।
- ০ ভূর চূল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ডু নির্মাণ করা এবং লোম ছিড়ে ছিড়ে মুখ পরিকার করা।
- ০ দাঁত ঘসে ঘসে সুচালো ও পাত্লা করা অথবা দাঁতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিদ্র তৈরী করা।
- ০ জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরী করা।

এসব বিধান সিহাহে সিভা ও মুসলাদে আহমাদে হ্যরত আয়েশা (রা), হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) ও আমীর মুআবীয়া (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরস্পরায় উদ্ভৃত হয়েছে।

আল্লাহ ও রসূলের এসব পরিকার নির্দেশ দেখার পর একজন মুসলিমের জন্য দু'টোই পথ খোলা থাকে। এক, সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এমনসব নেতৃত্ব জনাচার থেকে পরিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে এবং তাঁর রসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। দুই, যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুলোর বা এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে ও তাকে গোনাহ বলে শ্বেতার করে নেবে এবং অনর্থক অগব্যাধ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল পাচাত্য সমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করেই ক্ষত থাকে না বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং ইসলামে আদৌ পরদার কোন বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকসূলত ধৃষ্টভাও দেখিয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোন ভদ্র ও মাজিত মুসলিম সম্পর্ক ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আব্দেরাতে আল্লাহর কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের চাইতেও দুর্কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের এসব বিধানকে ভুল প্রতিগ্রহ করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসিম জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে। এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা মুসলমান থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অথবীন হয়ে যায়। যদি তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে তাদের নেতৃত্ব সাহসের শীর্কৃতি দিতাম। কিন্তু তাদের

وَأَنِكُحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءٍ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ^{৪৫}

তোমাদের মধ্যে যারা একা ও নিসংগে^{৫০} এবং তোমাদের গোলাম ও বৌদ্ধদের
মধ্যে যারা সৎ^{৫১} ও বিয়ের যোগ্য তাদের বিয়ে দাও।^{৫২} যদি তারা গরীব হয়ে
থাকে, তাহলে আল্লাহ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন,^{৫৩}
আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

অবস্থা হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা পোষণ করেও তারা মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের
চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ সম্ভবত দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরনের
চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকদের থেকে যে কোন প্রকার জালিয়াতী, প্রতারণা,
দাগাবাজী, আত্মসাত ও বিশ্বাসযাত্রকতা যোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

৫০. মূলে **ابামি**। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একে সাধারণত লোকেরা নিছক বিধবা
শব্দের অর্থে গ্রহণ করে থাকে। অথচ আসলে এ শব্দটি এমন সকল পুরুষ ও নারীর জন্য
ব্যবহৃত হয় যারা স্ত্রী বা স্বামীয়েন। **ابামি** শব্দটি এর বহুবচন। আর এমন
প্রত্যেক পুরুষকে বলা হয় যার কোন স্ত্রী নেই এবং এমন প্রত্যেক নারীকে বলা হয় যার
কোন স্বামী নেই। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি “একক” ও নিসংগ।”

৫১. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাদের মনোভাব ও আচরণ তালো এবং যাদের মধ্যে
তোমরা দাস্পত্য জীবন যাপনের যোগ্যতাও দেখতে পাও। যে গোলাম ও বৌদ্ধের আচরণ
মালিকের সাথে সঠিক নয় এবং যার মেজাজ দেখে বিয়ের পরে জীবন সংগীর সাথে তার
বনিবনা হবে বলে আশাও করা যায় না তাকে বিবাহ দেবার দায়িত্ব মালিকের উপর
চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কারণ এ অবস্থায় সে অন্য এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট করে দেবার জন্য
দায়ী হবে। এ শর্তটি স্বাধীন লোকদের ব্যাপারে আরোপ করা হয়নি। কারণ স্বাধীন ব্যক্তির
বিয়েতে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব আসলে একজন পরামর্শদাতা, সহযোগী ও পরিচিত
করাবার মাধ্যমের বেশী কিছু হয় না। বিবাহকারী ও বিবাহকারিনীর সমতির মাধ্যমে
আসল দাস্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু গোলাম ও বৌদ্ধের মধ্যে দাস্পত্য সম্পর্ক গড়ে
তোলার পূর্ণ দায়িত্ব হয় মালিকের। সে যদি জেনে বুঝে কোন হতভাগিনীকে একজন
বদুরভাব ও বদচরিত্রসম্পর্ক লোকের হাতে তুলে দেয় তাহলে এর সমস্ত দায়িত্বার তাকেই
বহন করতে হবে।

৫২. বাহ্যত এখানে আদেশমূলক ক্রিয়াপদ দেখে একদল আলেম মনে করেছেন, এ
কাজটি করা ওয়াজিব। অথচ বিষয়টির ধরন নিজেই বলছে, এ আদেশটি ওয়াজিব অর্থে
হতে পারে না। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তির বিয়ে করানো অন্যদের উপর ওয়াজিব হতে
পারে না। কার সাথে কার বিয়ে করানো ওয়াজিব? ধরা যাক, যদি ওয়াজিব হয়ে তাহলে
যার বিয়ে হতে হবে তার অবস্থা কি? অন্য লোকেরা যার সাথেই তার বিয়ে দিতে চায়
তার সাথে বিয়ে কি তার মেনে নেয়া উচিত? এটি যদি তার উপর ফরয হয়ে থাকে তাহলে

وَلِيُسْتَعِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فِضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ

আর যারা বিয়ে করার সুযোগ পায় না তাদের পবিত্রতা ও সাধুতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।^{৫৪}

আর তোমাদের মালিকানাধীনদের মধ্য থেকে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করে^{৫৫} তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও^{৫৬} যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।^{৫৭} আর আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও।^{৫৮}

বুঝতে হবে তার বিয়ে তার নিজের আয়ত্তে নেই। আর যদি তার অঙ্গীকার করার অধিকার থাকে তাহলে যাদের শুপর এ কাজ ওয়াজিব তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে? এসব দিক ভালোভাবে বিবেচনা করে অধিকাংশ ফকীহ এ রায় দিয়েছেন যে, আল্লাহর এ উক্তি এ কাজটিকে ওয়াজিব নয় বরং “মানুবু” বা পছন্দনীয় গণ্য করে। অর্থাৎ এর মানে হবে, মুসলমানদের সাধারণভাবে চিন্তা হওয়া উচিত তাদের সমাজে যেন লোকেরা অবিবাহিত অবস্থায় না থাকে। পরিবারের সাথে জড়িত লোকেরা, বস্তু-বাস্তব, প্রতিবেশী সবাই এ ব্যাপারে অগ্রহ নেবে এবং যার কেউ নেই তার এ কাজে সাহায্য করবে রাষ্ট।

৫৩. এর অর্থ এ নয় যে, যারই বিয়ে হবে আল্লাহ তাকেই ধনাঢ় করে দেবেন। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ ব্যাপারে খুব বেশী হিসেবী না বনে যায়। এর মধ্যে যেয়ে পক্ষের জন্যও নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, সৎ ও তদ্ব রুচিশীল ব্যক্তি যদি তাদের কাছে পয়গাম পাঠায়, তাহলে নিছক তার দারিদ্র দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করা হয়। ছেলে পক্ষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন যুবককে নিছক এখনো খুব বেশী আয়-রোজগার করছে না বলে যেন আইবুড়ো করে না রাখা হয়। আর যুবকদেরকেও উপদেশ দেয়া হচ্ছে, বেশী সচলতার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারকে অথবা পিছিয়ে দিয়ো না। সামান্য আয় রোজগার হলেও আল্লাহর শুপর ভরসা করে বিয়ে করে নেয়া উচিত। অনেক সময় বিয়ে নিজেই মানুষের আর্থিক সচলতার কারণ হয়ে দাঢ়ায়। স্ত্রীর সহায়তায় খরচপাতির শুপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব মাথার শুপর এসে পড়ার পর মানুষ নিজেও আগের চাইতেও বেশী পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অর্থকরী কাজে স্ত্রী সাহায্য করতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কার জন্য কি লেখা আছে তা কেউ জানতে পারে না। ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থায়ও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ভালো অবস্থায়। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবী হওয়া উচিত নয়।

৫৪. এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে। ইফরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

يَا مَعْشِرَ الشُّبَابِ مَنِ اسْطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائِثَةَ فَلِيَتَرْجُ فَانِّهُ أَغَضٌ
لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ

“হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেওয়া উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কৃষ্টি থেকে বৌচাবার এবং মানুষের সততা ও সতত রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর বাবু বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার জোয়া রাখা উচিত। কারণ জোয়া মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইশ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

ئَلَّا كُمْ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُّهُمُ النَّاكِحُونَ يُرِيدُونَ الْعَفَافَ وَالْمُكَابَرَ يُرِيدُونَ الْأَدَاءَ
وَالْغَارِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

প্রতিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যে চারিপ্রিক বিতর্কতা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেয়ার নিয়ম রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।” (তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ, আহমদ। এছাড়া আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন মিসা, ২৫ আয়াত।)

৫৫. মূল শব্দ হচ্ছে এর শাদিক অর্থ লিপিবদ্ধ। কিন্তু পারিভাষিক দিক দিয়ে এ শব্দটি তখন বলা হয় যখন কোন গোলাম বা বৈদী নিজের মুক্তির জন্য নিজের প্রভুকে একটি মূল্য দেবার প্রস্তাব দেয় এবং প্রভু সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় তখন উভয়ের মধ্যে এর শর্তাবলী লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামে গোলামদের মুক্ত করার জন্য যেসব পথ তৈরী করা হয়েছে এটি তার অন্যতম। এ মূল্য অর্থ বা সম্পদের আকারে দেয়া অপরিহার্য নয়। উভয় পক্ষের সমতিক্রমে প্রভুর জন্য কোন বিশেষ কাজ করে দেয়াও মূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চৃক্তি হয়ে থাবার পর কর্মচারীর স্বাধীনতায় অনর্থক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অধিকার প্রভুর থাকে না। মূল্য বাবদ দেয় অর্থ সঞ্চাহের জন্য সে তাকে কাজ করার সুযোগ দেবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গোলাম যখনই তার দেয় অর্থ বা তার উপর আরোপিত কাজ সম্পর্ক করে দেবে তখনই সে তাকে মুক্ত করে দেবে। হযরত উমরের আমলের ঘটনা। একটি গোলাম তার কর্তৃর সাথে নিজের মুক্তির জন্য লিখিত চৃক্তি করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চৃক্তিতে উত্ত্বেষিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে নিয়ে যায়। কর্তৃ বলে, আমিতো সম্মুদ্দয় অর্থ এক সাথে নেবো না। বরং বছরে বছরে যাসে যাসে বিভিন্ন কিন্তিতে নেবো। গোলাম হযরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগ করে। তিনি বলেন, এ অর্থ বায়তুল মালে দাখিল করে দাও এবং চলে যাও তুমি স্বাধীন। তারপর কর্তৃকে বলে পাঠান, তোমার অর্থ এখানে জমা হয়ে গেছে, এখন তুমি চাইলে এক

“সাথেই নিয়ে নিতে পারো অথবা আমরা বছরে বছরে মাসে মাসে তোমাকে দিতে থাকবো। (দারুলকৃত্নী, আবু সাইদ মুকবেরীর রেওয়ায়াতের মাধ্যমে)।

৫৬. একদল ফকীহ এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছেন যে, যখন কোন বাঁদী বা গোলাম মূল্য দানের বিনিময়ে মুক্তিলাভের লিখিত চূক্তি করার আবেদন জানায় তখন তা গ্রহণ করা প্রভুর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এটি আতা, আমর ইবনে দীনার, ইবনে সীরীন, মাসরুক, দাহহাক, ‘ইক্রামাহ, যাহেরীয়া ও ইবনে জারীর তাবারীর অভিমত। ইমাম শাফে’ঈশ্ব প্রথমে এরই প্রবণতা ছিলেন। হিতীয় দলটি বলেন, এটি ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব ও মান্দুব তথা পছন্দনীয়। এ দলে শা’বী, মুকতিল ইবনে হাইয়ান, হাসান বাস্রী, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, সুফিয়ান সওরী, আবু হাসীফ, মালেক ইবনে আনাসের মতো মনীষীগণ আছেন। শেষের দিকে ইমাম শাফে’ঈশ্ব এ মতের প্রবণতা হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম দলটির মতের সমর্থন করতো দু’টো জিনিস। এক, আয়াতের শব্দ **كَاتِبُهُمْ** “তাদের সাথে লিখিত চূক্তি করো।” এ শব্দাবলী পরিকার প্রকাশ করে যে, এটি আল্লাহর হকুম। দুই, নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয়, প্রথ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের পিতা সীরীন যখন তাঁর প্রভু হযরত আনাসের (রা) কাছে মূল্যের বিনিময়ে গোলামী মুক্ত হবার লিখিত চূক্তি করার আবেদন জানায় এবং তিনি তা গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেন তখন সীরীন হযরত উমরের (রা) কাছে নাশিশ করে। তিনি ঘটনা শুনে দোরুরা নিয়ে হযরত আনাসের (রা) ওপর ঝৌপিয়ে পড়েন এবং বলেন, আল্লাহর হকুম হচ্ছে, “গোলামী মুক্তির লিখিত চূক্তি করো।” (বুখারী) এ ঘটনা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় : এটি হযরত উমরের ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তিনি এ কাজ করেছিলেন এবং কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি, কাজেই এটি এ আয়াতের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। হিতীয় দলটির যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ শুধুমাত্র **فَكَاتِبُهُمْ** “তাদের সাথে লিখিত চূক্তি করো যাদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।” এ কল্যাণের সন্ধান পাওয়াটা এমন একটি শর্ত নির্ভর করে এক মাত্র মালিকের রায়ের ওপর। এর এমন কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই যার ভিত্তিতে কোন আদালত এটা যাচাই-পর্যালোচনা করতে পারে। আইনগত বিধানের রীতি এ নয়। তাই এ হকুমটিকে উপদেশের অধেই গ্রহণ করা হবে, আইনগত হকুমের অর্থে নয়। আর সীরীনের যে নজির পেশ করা হয়েছে তার জবাব তারা এভাবে দেন : সেকালে তো আর লিখিত চূক্তির আবেদনকারী গোলাম একজন ছিল না। নবীর যুগে ও খেলাফতে রাশেদার আমলে হাজার হাজার গোলাম ছিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক মুক্তির জন্য লিখিত চূক্তি করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সীরীনের ঘটনাটি ছাড়া কোন প্রভুকে আদালতের হকুমের মাধ্যমে গোলামী মুক্তির লিখিত চূক্তি করতে বাধ্য করার আর একটিও দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। কাজেই হযরত উমরের এ কাজটিকে আদালতের ফায়সালা মনে করার পরিবর্তে আমরা একে এ অর্থে গ্রহণ করতে পারি যে, তিনি মুসলমানদের মাঝখানে কেবল কার্যালয় ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং ব্যক্তি ও সমাজের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের মতো। অনেক সময় তিনি এমন অনেক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতেন যাতে একজন পিতাতো হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু একজন বিচারক পারেন না।

৫৭. কল্যাণ বলতে তিনটি জিনিস বুঝানো হয়েছে :

এক : চুক্তিবদ্ধ অর্থ আদায় করার ক্ষমতা গোলামের আছে। অর্থাৎ সে উপার্জন বা পরিশৰ্ম করে নিজের মুক্তি লাভের জন্য নিশ্চিট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারে। যেমন একটি মূরসাল হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اَنْ عِلْمَتُمْ فِيهِمْ حَرْفَةٍ وَ لَا تَرْسِلُوهُمْ كَلَّا عَلَى النَّاسِ

”যদি তোমরা জানো তারা উপার্জন করতে পারে তাহলে লিখিত চুক্তি করে নাও। তাদেরকে যেন সোকদের কাছে ভিক্ষা করতে ছেড়ে দিয়ো না।” (ইবনে কাসীর, আবু দাউদের বরাত দিয়ে)

দুই : তার কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে চুক্তি করা যায়, এতটুকু সততা ও বিশ্বাসতা তার মধ্যে আছে। এমন যেন না হয় যে, লিখিত চুক্তি করার পর সে মালিকের ধিদমত করা থেকে ছুটিও পেয়ে গেলো। আবার এ সময়ের মধ্যে যা কিছু আয়-রোজগার করে তাও যেয়ে পরে শেষ করে ফেললো।

তিনি : মালিক তার মধ্যে এমন কোন খারাপ নৈতিক প্রবণতা অথবা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্রতার এমন কোন তিক্ত আবেগ-অনুভূতি পাবে না যার ভিত্তিতে এ আশংকা হয় যে, তার স্বাধীনতা মুসলিম সমাজের জন্য ফতিকর ও বিপজ্জনক হবে। অন্য কথায় তার ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, সে মুসলিম দেশের ও সমাজের একজন তালো ও স্বাধীন নাগরিক হতে পারবে, কোন বিশ্বাসঘাতক ও ঘরের শক্র আস্তিনের সাপে পরিণত হবে না। এ প্রসংগে একথা সামনে রাখতে হবে যে, বিষয়টি ছিল যুদ্ধবন্দী সংক্রান্তও এবং তাদের সম্পর্কে অবশ্যি এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল।

৫৮. এটি একটি সাধারণ হকুম। প্রভু, সাধারণ মুসলমান এবং ইসলামী হকুমাত সবাইকে এখানে সংযোধন করা হয়েছে।

প্রভুদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদনকারীদের দেয় অর্থ থেকে কিছু না কিছু মাফ করে দাও। কাজেই বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয় সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের চুক্তিবদ্ধ গোলামদের দেয় অর্থ থেকে বেশ একটা বড় পরিমাণ অর্থ মাফ করে দিতেন। এমন কি হয়ত আলী (রা) হামেশা এক-চতুর্থাংশ মাফ করেছেন এবং এরি উপর্যুক্ত দিয়েছেন। (ইবনে জারীর)

সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে কোন লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার দেয় অর্থ আদায় করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাবে, তাদেরকে যেন প্রাণ খুলে সাহায্য করে। কুরআন মর্জিদে যাকাতের যে ব্যয় ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে **فِي الرِّقَابِ** তার মধ্যে একটি। অর্থাৎ “দাসত্বের জোয়াল থেকে গর্দানমুক্ত করা।” (সূরা ততুবা, ৬০ আয়াত) আর আল্লাহর নিকট **فِي رِقْبَةِ** “গর্দানের বাঁধন খেলা” একটি বড় নেকীর কাজ। (সূরা বালান, ১৩ আয়াত) হাদীসে বলা হয়েছে : এক গ্রামীন ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আমি জানাতে প্রবেশ করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তুমি অতি সংক্ষেপে অনেক বড় কথা জিজেস

করেছে। গোলামকে মুক্ত করে দাও, গোলামদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করে, কাউকে পশু দান করলে অত্যধিক দুর্ধেল পশু দান করো এবং তোমার যে আঙ্গীর তোমার প্রতি জুগুম করে তুমি তার সাথে সৎ ব্যবহার করো। আর যদি তা না করতে পারো, তাহলে অভুক্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, মানুষকে তালো কাঞ্জ করার উপদেশ দাও এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো, আর খনি এও না করতে পারো, তাহলে নিজের যথ বহু করে রাখো। যথ খুগলে তালোর জন্য খুলবে আর নয়তো বহু করে রাখবে।” (বায়হাকী ফী শ'আবিল ঈমান, আনিল বাগাজা ইবনে আযিব।)

ইসলামী রাষ্ট্রকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বায়তুল মালে যে যাকাত জমা হয় তা থেকে নিহিত চৃক্ষিকে গোলামদের মুক্তির জন্য একটি অংশ বায় করো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগে তিনি ধরনের গোলাম হতো। এক, যুদ্ধবলী। দুই, স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে গোলাম বানানো হতো এবং তারপর তাকে বিক্রি করা হতো তিনি, যারা বংশানুকূলিকভাবে গোলাম হয়ে আসছিল, তাদের বাপ-দাদাকে কবে গোলাম বানানো হয়েছিল এবং ওপরে উল্লেখিত দু' ধরনের গোলামের মধ্যে তারা ছিল কোন্ ধরনের তা জানার কোন উপায় ছিল না। ইসলামের আগমনের সময় আরব ও অরবের বাইরের জগতের মানব মধ্যে এ ধরনের গোলামে পরিপূর্ণ ছিল। অধৈনেতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা শার্মিক ও চাকর বাধুরদের চাইতে এ ধরনের গোলামদের উপর বেশী নির্ভরশীল ছিল; ইসলামের সামনে প্রথম প্রশ্ন ছিল, পূর্ব থেকে এই যে গোলামদের ধরা' চলে আসছে এদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আগামীর জন্য গোলামী সমস্যার কি সমাধান দেয়, ধায়? প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইসলাম কোন আকর্ষিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রাচীনকাল থেকে গোলামদের যে বংশানুকূলিক ধারা চলে আসছিল হাঁৎ তাদের সবার উপর থেকে মালিকানা অধিকার খতম করে দেয়নি। কারণ এর ফলে শুধু যে, সামাজিক ও অধৈনেতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো তই নয় বরং আরবকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের চাইতেও অনেক বেশী কঠিন ও ধূসকর গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হতো। এরপরও মূল সমস্যার কোন সমাধান হতো না, যেমন আমেরিকায় হয়নি এবং কালোদের (Negroes) লালুনার সমস্যা সেখানে রয়েই গোছে। এ নির্বোধ সূলত ও অবিবেচনা-প্রস্তুত সংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলাম ফুর্কে তথা দাসমুক্তির একটি শক্তিশালী নৈতিক আলোচনা শুরু করে এবং উপদেশ, উসাহ-উদ্দেশ্য, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও দেশজ অঙ্গীন-কানুনের মাধ্যমে গোকদেরকে গোলাম আজাদ করতে উদ্ব�ৃত্ত করে তাদেরকে আবেরোতে নির্ভুল সাত করার জন্য খেছেয়ে গোলাম আজাদ করার অথবা নিজের গোলামের কাফ্ফারা দেবার জন্য গোলামদেরকে মুক্তি দানের কিংবা আর্দ্র বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে উসাহিত করে। এ আদোলনের আত্মাধীনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ৬৩ জন গোলামকে মুক্ত করে দেন। তার স্ত্রীগণের মধ্য থেকে একমাত্র হয়রত আয়েশারাই (রা) আজাদসূত গোলামদের সংখ্যা ছিল ৬৭। রসূলগ্রাহ (সা) চাচা হয়রত আবুস রাম (রা) নিজের জীবনে ৭০ জন গোলামকে স্বাধীন করে দেন। হাকিম ইবনে হিয়াম ১০০, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ১০০০, মূল কিলাই হিয়েয়ারী ৮ হাজার এবং আবদুর রহমান ইবনে অউফ ৩০ হাজার গোলামকে আজাদ করে দেন। এমনি ধরনের ঘটনা অন্যান্য সাহাবীদের জীবনেও ঘটেছে। এদের মধ্যে হয়রত আবু বকর

وَلَا تُكِرْهُوْ فَتِيْكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنْ تَحْصِنَا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يَكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْتَ مُبِينَ ۝ وَمِثْلًا مِنَ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ رَوْمَعَظَةً لِلْمُتَقِّنِ ۝

আর তোমাদের বৌদ্ধীরা যখন নিজেরাই সতী সাক্ষী থাকতে চায় তখন দুনিয়াবী স্বার্থপ্রাপ্তের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করো না। ৫৯ আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে এ জ্ঞান-জ্ঞবরদণ্টির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আমি ঘৃথহীন পথনির্দেশক আয়াত তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিদের শিক্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং মুভাকীদের জন্য উপদেশও দিয়েছি। ৬০

(ৱা) ও হ্যারত উম্বের (ৱা) নাম বিশেষভাবে উত্তোলিযোগ্য। এটি হিল আল্লাহর স্বৃষ্টি-পাতের একটি সাধারণ প্রেরণা। এ প্রেরণায় উচ্চ হয়ে লোকেরা ব্যাপকভাবে নিজেদের গোলামদেরকেও মুক্ত করে দিতেন এবং অন্যদের গোলাম কিনে নিয়েও তাদেরকে আজাদ করে দিতে থাকতেন। এভাবে খোলাফারে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার আপেই পূর্ব মুসের প্রায় সমস্ত গোলামই মুক্তিলাভ করেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতে কি হবে। এ ব্যাপারে ইসলাম কোন বাধীন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গোলাম বানানো এবং তার কেনা বেচা করার ধারাকে পুরোপুরি হারাম ও আইনগতভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। তবে যুক্তবন্ধীদেরকে শুনুমাত্র এমন অবস্থায় গোলাম বানিয়ে রাখার অনুমতি (আদেশ নয় বরং অনুমতি) দেয় যখন তাদের সরকার আমাদের যুক্তবন্ধীদের সাথে তাদের যুক্তবন্ধীদের বিনিয়ন করতে রাজী হয় না এবং তারা নিজেরাও নিজেদের মুক্তিপুণ আদায় করে না। তারপর এ গোলামদের জন্য একদিকে তাদের মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করার পথ খোলা রাখা হয় এবং অন্যদিকে থাট্টান গোলামদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ হিল তা সবই তাদের পক্ষে বহুল ধাকে, যেমন নেকীর কাজ মনে করে আল্লাহর স্বৃষ্টি অর্জনের লক্ষে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া অথবা গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করার জন্য তাদেরকে আজাদ করা কিংবা কোন ব্যক্তির নিজের জীবন্দশায় গোলামকে গোলাম হিসেবে রাখা এবং পরবর্তীকালের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া যে, তার মৃত্যুর পরই সে আজাদ হয়ে থাবে (ইসলামী কিকাহের পরিভাষায় একে বলা হয় তাদৰীর এবং এ ধরনের গোলামকে “মুদারার” বলা হয়)। অথবা কোন ব্যক্তি নিজের বৌদ্ধীর সাথে সংশয় করা এবং তার গর্ভে স্তান জন্মাত্ব করা,

এ অবস্থায় মালিক অসিয়ত করুক বা না করুক মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথেই সে নিজে নিজেই স্বাধীন হয়ে যাবে। ইসলাম গোলামী সমস্যার এ সমাধান দিয়েছে। অঙ্গ আপন্তিকারীরা এগুলো না বুঝে আপন্তি করে বসেন। পক্ষান্তরে ওজর পেশকারীগণ ওজর পেশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত এ বাস্তব সত্যটাকেই অঙ্গীকার করে বসেন যে, ইসলাম গোলামীকে কোন না কোন আকারে টিকিয়ে রেখেছিল। (তা যে কারণেই হোক না কেন।)

৫৯. এর অর্থ এ নয় যে, বাঁদীরা নিজেরা যদি সতীসাধী না থাকতে চায়, তাহলে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, বাঁদী যদি স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে নিষ্ঠ হয়, তাহলে নিজের অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী, তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোর করে তাকে এ পেশায় নিয়োগ করে, তাহলে এ জন্য মালিক দায়ী হবে এবং সে পাকড়াও হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, জোর করার পশ্চ তখনই দেখা দেয় যখন কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর “দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে” বাক্যাংশটি দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়নি যে, যদি মালিক তার উপার্জন না খায় তাহলে বাঁদীকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার কারণে সে অপরাধী হবে না বরং বুঝানো হয়েছে যে, এ অবৈধ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনও হারামের শামিল।

কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞাটির পূর্ণ উদ্দেশ্য নিছক এর শদাবলী ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যেতে পারে না। একে ভালোভাবে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে এ হকুমটি নাযিল হয় সেগুলোও সামনে রাখা জরুরী। সেকালে আরব দেশে দু'ধরনের পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল। এক, ঘরোয়া পরিবেশে গোপন বেশ্যাবৃত্তি এবং দুই, যথারীতি বেশ্যাপাড়ায় বসে বেশ্যাবৃত্তি।

ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তিতে নিষ্ঠ থাকতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপ্রাণী বাঁদীরা, যাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না। অথবা এমন ধরনের স্বাধীন মেয়েরা, কোন পরিবার বা গোত্র যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। তারা কোন গৃহে অবস্থান করতো এবং একই সংগে কয়েকজন পুরুষের সাথে তাদের এ মর্মে চুক্তি হয়ে যেতো যে, তারা তাকে সাহায্য করবে ও তার ব্যয়ভার বহন করবে এবং এর বিনিময়ে পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে। সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা যে পুরুষ সম্পর্কে বলে দিতো যে, এ সন্তান অমুকের। সে-ই সন্তানের পিতা হিসেবে স্বীকৃত হতো। এটি যেন ছিল জাহেলী সমাজের একটি স্বীকৃত প্রথা। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা একে এক ধরনের ‘বিয়ে’ মনে করতো। ইসলাম এসে বিয়ের জন্য ‘এক মেয়ের এক স্বামী’ এ একমাত্র পদ্ধতিকেই চালু করলো। এ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পদ্ধতি আপনা আপনিই যিনা হিসেবে গণ্য হয়ে অপরাধে পরিণত হয়ে গেলো; (আবু দাউদ, বাবুন ফী অজুহিন নিকাহ আল্লাতী কানা ইয়াতানাকিহ আহলুল জাহেলিয়াহ)।

দ্বিতীয় অবস্থাটি অর্থাৎ প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হতো বাঁদীদেরকেই। এর দু'টি পদ্ধতি ছিল। প্রথমত লোকেরা নিজেদের যুবতী বাঁদীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট অংক চাপিয়ে দিতো। অর্থাৎ প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাদেরকে দিতে হবে। ফলে তারা দেহ বিক্রয় করে তাদের এ দাবী পূর্ণ করতো। এ ছাড়া অন্য কোন

পথে তারা এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেও পারতো না। আর তারা কোন পবিত্র উপায়ে এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এনেছে বলে তাদের মালিকরাও মনে করতো না। যুবতী বাঁদীদের ওপর সাধারণ মজুরদের ত্তলনায় কয়েকগুণ বেশী রোজগার করার বোৰা চাপিয়ে দেবার এ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। হিতীয় পদ্ধতি ছিল, লোকেরা নিজেদের সুন্দরী যুবতী বাঁদীদেরকে আলাদা ধরে বসিয়ে রাখতো এবং তাদের দরজায় ঝাঙা গেড়ে দিতো। এ চিহ্ন দেখে দূর থেকেই “ক্ষুধার্তরা” বুবতে পারতো কোথায় তাদের ক্ষুধা নির্বৃত্ত করতে হবে। এ মেয়েদেরকে বলা হতো “কালীকীয়াত” এবং এদের গৃহগুলো “মাওয়ায়াইর” নামে পরিচিত ছিল। বড় বড় গণ্যমান্য সমাজপতিরা এ ধরনের বেশ্যালয় পরিচালনা করতো। স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক প্রধান, যাকে নবী সাল্লাহুার আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল এবং যে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনোর কাজে সবার আগে ছিল) মদীনায় এ ধরনের একটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিল। সেখানে ছিল ছয়জন সুন্দরী বাঁদী। তাদের মাধ্যমে সে কেবলমাত্র অর্থই উপার্জন করতো না বরং আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নামী দামী মেহমানদের আদর আপ্যায়নও তাদের দিয়েই করাতো। তাদের অবৈধ সন্তানদের সাহায্যে সে নিজের পাইক, বরকন্দাজ ও সাঠিয়ালের সংখ্যা বাঢ়াতো। এ বাঁদীদেরই একজনের নাম ছিল মু’আয়াহ। সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং এ পেশা থেকে তাওবা করতে চাচ্ছিল। ইবনে উবাই তার ওপর জোর জবরদস্তি করলো। সে গিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে নালিশ করলো। তিনি ব্যাপারটি রসূলের (সা) কাছে পৌছে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) জালেমের কব্জা থেকে বাঁদীটিকে বের করে আনার হকুম দিলেন। (ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৫৫-৫৮ এবং ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা, আল ইস্তি’আব লি ইবনি আবদিল বার, ২ খণ্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩ খণ্ড, ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা)। এ সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আয়াত নায়িল হয়। এ পটভূমি দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে পরিষ্কার জানা যাবে, শুধুমাত্র বাঁদীদেরকে যিনার অপরাধে জড়িত হতে বাধ্য করার পথে বাধা সৃষ্টি করাই নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির (Prostitution) ব্যবসায়কে সম্পূর্ণরূপে আইন বিরোধী গণ্য করা এবং এই সংগে যেসব মেয়েকে জোর জবরদস্তি এ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয় তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণাও এখানে এর মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ফরমান এসে যাবার পর নবী সাল্লাহুার আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন **المساعاة في الإسلام لا يدخل** “ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোন অবকাশই নেই।” (আবু দাউদ, ইবনে আবাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে, বাবুন ফৌ ইন্দিআয়ে ওয়ালাদিয় যিনা) হিতীয় যে হকুমটি তিনি দেন সেটি ছিল এই যে, যিনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হারাম, নাপাক ও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রাফে’ ইবন খাদীজের রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী কর্নীম (সা) **مُهَرُ الْبَغْيِ** অর্থাৎ যিনার বিনিময়ে অর্জিত অর্থকে নষ্ট, সর্বাধিক অকল্যাণ্মূলক উপার্জন, অপবিত্র ও নিন্দিতম আয় গণ্য করেন। (আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসাই) আবু হজাইফা (রা) বলেন, **كَسْبُ الْبَغْيِ** অর্থাৎ দেহ বিক্রয়লক অর্থকে হারাম গণ্য করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ) আবু মাস’উদ উকবাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়াত হচ্ছে, **رَسُولُ اللَّهِ** (সা) **مُهَرُ الْبَغْيِ** তথা যিনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের শেনদেনকে নিযিদ্ধ গণ্য করেছেন। (সিহাহে সিন্দা ও আহমদ) তৃতীয় যে হকুমটি তিনি দিয়েছিলেন তা

ছিল এই যে, বাঁদীর কাছ থেকে বৈধ পত্রায় কেবলমাত্র হাত ও পায়ের শর্ম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মনিব তার ওপর এমন পরিমাণ কোন অর্থ চাপিয়ে দিতে বা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারে না যে সম্পর্কে সে জানে না এ অর্থ সে কোথা থেকে ও কিভাবে উপার্জন করে। 'রাফে' ইবনে খাদীজ বলেন :

نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يَعْلَمُ
مِنْ أَيْنَ هُوَ -

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর মাধ্যমে কোন উপার্জন নিষিদ্ধ গণ্য করেন যতক্ষণ না একথা জানা যায় যে, এ অর্থ কোথা থেকে অর্জিত হয়।” (আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ)

রাফে' ইবনে রিফা'আহ আনসারীর বর্ণনায় এর চাইতেও সুস্পষ্ট হকুম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে :

نَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ
بِيَدِهَا وَقَالَ هَكُذا بِاصْبَابِهِ نَحْنُ الْخُبْذِيُّ وَالْغَزْلُ وَالنَّفْشُ -

“আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর সাহায্যে অর্থোপর্জন করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, তবে হাতের সাহায্যে পরিষম করে সে যা কিছু কামাই করে তা ছাড়া। এবং তিনি হাতের ইশারা করে দেখান যেমন এভাবে রুটি তৈরি করা, সূতা কাটা বা উল ও তুলা ধোনা।” (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ)

একই বক্তব্য সরলিত একটি হাদীস আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে **কস্ব الْأَمَةِ** (বাঁদীর কামাই) ও **مَهْرَ الْبَغْيِ** (ব্যচিত্তারের উপার্জন) গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেকালে আরবে প্রচলিত বেশ্যাবৃত্তির সকল পদ্ধতিকে ধর্মীয় দিক দিয়ে অবৈধ ও আইনগত দিক দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বরং আরো অগ্রসর হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বাঁদী মু'আয়ার ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত তিনি দেন তা থেকে জানা যায়, যে বাঁদীকে তার মালিক জোর করে এ পেশায় নিয়োগ করে তার ওপর থেকে তার মালিকের মালিকানা সত্ত্বও খতম হয়ে যায়। এটি ইমাম যুহুরীর রেওয়ায়াত। ইবনে কাসীর মুসনাদে আবদুর রায়যাকের বরাত দিয়ে তাঁর গত্তে এটি উদ্ভৃত করেছেন।

৬০. এ আয়াতটির সম্পর্ক কেবলমাত্র ওপরের শেষ আয়াতটির সাথে নয়। বরং সূরার শুরু থেকে এখান পর্যন্ত যে বর্ণনা ধারা চলে এসেছে তার সবের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। দ্যৰ্থহীন পথ নির্দেশক আয়াত বলতে এমনসব আয়াত বুঝানো হয়েছে যেগুলোতে যিনা, কায়ফ ও লিঙ্গানের আইন বর্ণনা করা হয়েছে, ব্যচিত্তারী পুরুষ ও মহিলার সাথে মু'মিনদের বিয়েশাদী না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সৎ চরিত্রবান ও সন্তুষ্ট লোকদের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ দেয়া এবং সমাজে দুষ্কৃতি ও অশ্রীলতার প্রচার ও প্রসারের পথ বক্তব্য

الله نور السموت والأرض مثُل نور كمشكوة فيها مصباح
 الْمِصَبَّاحِ فِي زَجَاجَةٍ أَلْزَجَاجَةَ كَانَهَا كَرْكَبٌ دَرِي يُوقَدُ مِنْ
 شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرِقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لِيَكَادُ زَيْتُهَا يَضْعُفُ
 وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْلِي اللَّهُ لِنُورٍ مِنْ يَشَاءُ
 وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৫ রংকু'

আঘাহ^{৬১} আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো।^{৬২} (বিশ-জাহানে) তাঁর আলোর উপর্যুক্ত যেন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপটি আছে একটি চিমনির মধ্যে, চিমনিটি দেখতে এমন যেন মুকোর মতো বকমকে লক্ষ্য; আর এ প্রদীপটি যহুনের এমন একটি মুবারক^{৬৩} গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়।^{৬৪} যার তেল আপনা আপনিই জুলে ওঠে, চাই আগুন তাকে স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর ওপরে আলো (বৃক্ষের সমস্ত উপকরণ একত্র হয়ে গেছে।)^{৬৫} আঘাহ যাকে চান নিজের আলোর দিকে পথনির্দেশ করেন।^{৬৬} তিনি উপমার সাহায্যে লোকদের কথা বুঝান। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস খুব তালো করেই জানেন।^{৬৭}

করা হয়েছে, পুরুষ ও নারীকে দৃষ্টিসংযত ও যৌনাংগ হেফাজত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে, নারীদের জন্য পরদার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, বিবাহযোগ্য লোকদের বিবাহ না করে একাকী জীবন যাপনকে অপছন্দ করা হয়েছে, গোলামদের আজাদীর জন্য লিখিত চুক্তি করার নিয়ম প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে এবং সমাজকে বেশ্যাবৃত্তির অভিশাপ মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব কথা বলার পর বলা হচ্ছে, আঘাহকে তাঁর সহজ সরল পথ অনলম্বনকারীদেরকে যেতাবে শিক্ষা দেয়া দরকার তাতে আমি দিয়েছি, এখন যদি তোমরা এ শিক্ষার বিপরীত পথে চলো, তাহলে এর পরিকার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তোমরা এমন সব জাতির মতো নিজেদের পরিণাম দেখতে চাও যাদের তয়াবহ ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমি এ কুরআনে তোমাদের সামনে পেশ করেছি।—সম্ভবত একটি নির্দেশনামার উপসংহারে এর চেয়ে কড়া সতর্কবাণী আর হতে পারে না। কিন্তু অবাক হতে হয় এমন জাতির কার্যকলাপ দেখে যারা এ নির্দেশনামা তেলাওয়াতও করে আবার এ ধরনের কড়া সাবধান বাণীর পরও এর বিপরীত আচরণও করতে থাকে!

৬১. এখান থেকে শুরু হয়েছে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ। ইসলামী সমাজের মধ্যে অবস্থান করে তারা একের পর এক গোলযোগ ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে চলছিল এবং ইসলাম,

ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী রাষ্ট্র ও দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে তৎপর ছিল যেমন বাইরের প্রকাশ কাফের ও দুশমনরা তৎপর ছিল। তারা ছিল ইমানের দাবীদার। মুসলমানদের অন্তরভুক্ত ছিল তারা। মুসলমানদের বিশেষ করে আনসারদের সাথে ছিল তাদের আত্মিয়তা ও ভাতৃত্ব সম্পর্ক। এ জন্য তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা বিস্তারের সুযোগও বেশী পেতো এবং কোন কোন আতরিকতা সম্পর্ক মুসলমানও নিজের সরলতা বা দুর্বলতার কারণে তাদের ত্রীড়নক ও পৃষ্ঠপোষকেও পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু আসলে বৈষম্যিক স্বার্থ তাদের চোখ অঙ্গ করে দিয়েছিল এবং ইমানের দাবী সন্ত্রেও কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদৌলতে দুমিয়ায় যে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে তারা ছিল একেবারেই বিখিত। এ সুযোগে তাদেরকে সমোধন না করে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তিনটি উদ্দেশ্য। প্রথমত তাদেরকে উপদেশ দেয়া। কারণ আল্লাহর রহমত ও রবুবিয়াতের প্রথম দাবী হচ্ছে, পথচার ও বিভাস মানুষকে তার সকল নষ্টামি ও দুর্ভুতি সন্ত্রেও শেষ সময় পর্যন্ত বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত ইমান ও মুনাফিকির পার্থক্যকে পরিকার ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দেয়া। এভাবে কোন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য মুনিম সমাজে মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে ফারাক করা কঠিন হবে না। আর এ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনার পরও যে ব্যক্তি মুনাফিকদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে সে তার নিজের এ কাজের জন্য পুরোপুরি দায়ী হবে। তৃতীয়ত মুনাফিকদেরকে পরিকার ভাষায় সতর্ক করে দেয়া। তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া যে, মুমিনদের জন্য আল্লাহর যে ওয়াদা রয়েছে তা কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা সাচা দিলে ইমান আনে এবং তারপর এ ইমানের দাবী পূরণ করে। এ প্রতিশ্রূতি এমন লোকদের জন্য নয় যারা নিছক আদম শুমারীর মাধ্যমে মুসলমানদের দলে তিঢ়ে গেছে। কাজেই মুনাফিক ও ফাসিকদের এ প্রতিশ্রূতির মধ্য থেকে কিছু অংশ পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।

৬২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী শব্দ সাধারণভাবে কুরআন মজীদে “বিশ-জাহান” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অন্য কথায় আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে : আল্লাহ সমগ্র বিশ-জাহানের আলো।

আলো বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যার বদৌলতে দ্রব্যের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ যে নিজে নিজে প্রকাশিত হয় এবং অন্য জিনিসকেও প্রকাশ করে দেয়। মানুষের চিত্তায় নূর ও আলোর এটিই আসল অর্থ। কিছুই না দেখা যাওয়ার অবস্থাকে মানুষ অন্ধকার নাম দিয়েছে। আর এর বিপরীতে যখন সবকিছু দেখা যেতে থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিস প্রকাশ হয়ে যায় তখন মানুষ বলে আলো হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য “নূর” তথা আলো শব্দটির ব্যবহার এ মৌলিক অর্থের দিক দিয়েই করা হয়েছে। নাউয়ুবিল্লাহ তিনি এমন কোন আলোকরশ্মি নন যা সেকেতে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে এবং আমাদের চোখের পরদায় পড়ে মন্তিক্ষের দৃষ্টিকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে, আলোর এ ধরনের কোন অর্থ এখানে নেই। মানুষের মন্তিক্ষ যে অর্থের জন্য এ শব্দটি উদ্ভাবন করেছে, আলোর এ বিশেষ অবস্থা সে অর্থের মৌল তত্ত্বের অন্তরভুক্ত নয়। বরং তার ওপর এ শব্দটি আমরা এ বন্ধুজগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যে আলো ধরা দেয় তার দৃষ্টিতে প্রয়োগ করি। মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের

আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অংগের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সবসময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক র্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বর্ব বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোন আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব। অনুরূপতাবে “নূর” বা আলো সম্পর্কেও একধা মনে করা নিষ্কর্ষ একটি সংকীর্ণ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এর অর্থের ম্তের শুধুমাত্র এমন রশ্মিরই আকারে পাওয়া যেতে পারে যা কোন উজ্জ্বল অবয়ব থেকে বের হয়ে এসে চোখের পরদায় প্রতিফলিত হয়। এ সীমিত অর্থে আল্লাহ আলো নন বরং ব্যাপক, সার্বিক ও আসল অর্থে আলো। অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে তিনিই একক আসল “প্রকাশের কার্যকারণ”, বাকি সবই এখানে অঙ্ককার ছাড়া আর কিছুই নয়; অন্যান্য আশোক বিতরণকারী জিনিসগুলোও তাঁরই দেয়া আলো থেকে আলোকিত হয় ও আগো দান করে। নয়তো তাদের কাছে নিজের এমন কিছু নেই যার সাহায্যে তারা এ ধরনের বিশ্বাকর কাণ করতে পারে।

আলো শব্দের ব্যবহার জ্ঞান অর্থেও হয় এবং এর বিপরীতে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে অঙ্ককার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ অর্থেও আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের আলো কেননা, এখানে সত্ত্বের সক্রান্ত ও সঠিক পথের জ্ঞান একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই এবং তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দান গ্রহণ করা ছাড়া মৃত্তা ও অজ্ঞতার অঙ্ককার এবং তার ফলশ্রুতিতে ভুঁটা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

৬৩. মুবারক অর্থাৎ বহুল উপকারী, বহুমুখী কল্যাণের ধারক।

৬৪. অর্থাৎ যা খোলা ময়দানে বা উচ্চ জায়গায় অবস্থান করে। যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর রোদ পড়ে। তার সামনে প্রেছেন কোন আড় থাকে না যে, কেবল সকালের রোদটুকু বা বিকালের রোদটুকু তার ওপর পড়ে। এমন ধরনের যয়তুন গাছের তেল বেশী স্বচ্ছ হয় এবং বেশী উজ্জ্বল আলো দান করে। নিষ্কর্ষ পূর্ব বা নিষ্কর্ষ পাচ্চম অঞ্চলের যয়তুন গাছ তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছ তেল দেয় এবং প্রদীপে তার আলোও হালকা থাকে।

৬৫. এ উপর্যায় প্রদীপের সাথে আল্লাহর সত্তাকে এবং তাকের সাথে বিশ্ব-জাহানকে তুলনা করা হয়েছে। আর চিমনি বলা হয়েছে এমন পরদাকে যার মধ্যে মহাসত্ত্বের অধিকারী সমস্ত সৃষ্টিকূলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, অর্থাৎ এ পরদাটি যেন গোপন করার পরদা নয় বরং প্রবল প্রকাশের পরদা। সৃষ্টির দৃষ্টি যে তাঁকে দেখতে অক্ষম এর কারণ এটা নয় যে, মাঝখানে অঙ্ককার আছে, বরং আসল কারণ হচ্ছে, মাঝখানের পরদা স্বচ্ছ এবং এ স্বচ্ছ পরদা অতিক্রম করে আগত আলো এত বেশী তীক্ষ্ণ, তীব্র, অবিমিশ্র ও পরিবেষ্টনকারী যে, সীমিত শক্তি সম্পর্ক চক্ষু তা দেখতে অক্ষম হয়ে গেছে। এ দুর্বল চোখগুলো কেবলমাত্র এমন ধরনের সীমাবদ্ধ আলো দেখতে পারে যার

মধ্যে কমবেশী হতে থাকে, যা কখনো অত্তরহিত আবার কখনো উদিত হয়, যার বিপরীতে কোন অঙ্ককার থাকে এবং নিজের বিপরীতধর্মীর সামনে এসে সে সমৃজ্জুল হয়। কিন্তু নিরেট, ভরাট ও ঘন আলো, যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীই নেই, যা কখনো অত্তরহিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না এবং যা সবসময় একইভাবে সব দিক আচ্ছন্ন করে থাকে তাকে পাওয়া ও তাকে দেখা এদের সাধ্যের বাইরে।

আর “এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয় পচিমের নয়।” এ বক্তব্য কেবলমাত্র প্রদীপের আলোর পূর্ণতা ও তার তীব্রতার ধারণা দেবার জন্য বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে যয়তুনের তেলের প্রদীপ থেকেই সর্বাধিক পরিমাণ আলোক লাভ করা হতো। এর মধ্যে আবার উচু ও খোলা জায়গায় বেড়ে উঠা যয়তুন গাছগুলো থেকে যে তেল উৎপন্ন হতো সেগুলোর প্রদীপের আলো হতো সবচেয়ে জোরালো। উপমায় এ বিষয়বস্তুর বক্তব্য এই নয় যে, প্রদীপের সাথে আগ্নাহর যে সস্তার তুলনা করা হয়েছে তা অন্য কোন জিনিস থেকে শক্তি (Energy) অর্জন করছে। বরং একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, উপমায় কোন মামুলি ধরনের প্রদীপ নয় বরং তোমাদের দেখা উজ্জ্বলতম প্রদীপের কথা চিন্তা করো। এ ধরনের প্রদীপ যেমন সারা ঘর বাড়ি আলোকোজ্জ্বল করে ঠিক তেমনি আগ্নাহর সস্তাও সারা বিশ্ব-জাহানকে আলোক নগরীতে পরিণত করে রেখেছে।

আর এই যে বলা হয়েছে, “তার তেল আপনা আপনিই জ্বলে উঠে আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও”, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদীপের আলোকে অত্যধিক তীব্র করার ধারণা দেয়া। অর্থাৎ উপমায় এমন সর্বাধিক তীব্র আলো দানকারী প্রদীপের কথা চিন্তা করো যার মধ্যে এ ধরনের ব্রহ্ম ও চরম উত্তেজক তেল রয়েছে। এ তিনটি জিনিস অর্থাৎ যয়তুন, তার পূরবীয় ও পশ্চিমী না হওয়া এবং আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তার তেলের আপনা আপনি জ্বলে উঠা উপমার ব্রতন্ত অংশ নয় বরং উপমার প্রথম অংশের অর্থাৎ প্রদীপের আনন্দংগিক বিশ্বযাদির অস্তরভূক্ত। উপমার আসল অংশ তিনটি : প্রদীপ, তাক ও ব্রহ্ম চিমনি বা কাঁচের আবরণ।

আয়াতের “তাঁর আলোর উপমা যেমন” এ বাক্যাংশটিও উল্লেখযোগ্য। “আগ্নাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো” আয়াতের একথাগুলো পড়ে কারোর মনে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো ওপরের বাক্যাংশটির মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায়, আগ্নাহকে “আলো” বলার মানে এ নয় যে, নাউয়াবিগ্নাহ, আলোই তাঁর স্বরূপ। আসলে তিনি তো ইচ্ছেন একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংশ সস্তা। তিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, প্রাঞ্জল, বিচক্ষণ ইত্যাদি হবার সাথে সাথে আলোর অধিকারীও। কিন্তু তাঁর সস্তাকে আলো বলা হয়েছে নিছক তাঁর আলোকোজ্জ্বলতার পূর্ণতার কারণে। যেমন কারোর দানশীলতা গুণের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করার জন্য তাকেই “দান” বলে দেয়া অথবা তার সৌন্দর্যের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং তাকেই সৌন্দর্য আখ্যা দেয়া।

৬৬. যদিও আগ্নাহের এ একক ও একচ্ছত্র আলো সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত করছে কিন্তু তা দেখার, জ্ঞানার ও উপলক্ষ্য করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তা উপলক্ষ্য করার সুযোগ এবং তার দানে অনুগৃহীত হবার সৌভাগ্য আগ্নাহই যাকে চান তাকে দেন। নয়তো অঙ্কের জন্য যেমন দিনরাত সমান ঠিক তেমনি অবিবেচক ও অদ্বৰদশী মানুষের জন্য

فِي بَيْوِتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ لَا يُسْبِئُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُنْوِ الْأَصَالِ ۝ رِجَالٌ لَا تَلِهِمُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْعَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُوْةِ ۝ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقْلِبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَحْزِمُهُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيَرَبِّلُهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী) এই সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম অ্বরণ করার হৃত্য আল্লাহ দিয়েছেন। ৬৮ সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সৌরে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর অ্বরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে। (আর তারা এসব কিছু এ জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন। ৬৯

বিজলী, সূর্য, চাঁদ ও তারার আলো তো আলোই, কিন্তু আল্লাহর নূর ও আলো সে ঠাহর করতে পারে না। এ দিক থেকে এ দুর্ভাগার জন্য বিশ্ব-জাহানে সবদিকে অঙ্ককারই অঙ্ককার। দুঃখে অঙ্ক। তাই নিজের একান্ত কাছের জিনিসই সে দেখতে পারে না। এমনকি তার সাথে ধাক্কা খাওয়ার পরই সে জানতে পারে এ জিনিসটি এখানে ছিল। এভাবে ভিতরের চোখ যার অঙ্ক অর্ধাং যার অন্তরদৃষ্টি নেই সে তার নিজের পাশেই আল্লাহর আলোয় যে সত্য জুলজুল করছে তাকেও দেখতে পায় না। যখন সে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের শিকলে বাঁধা পড়ে কেবলমাত্র তখনই তার সঙ্কান পায়।

৬৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, তিনি জানেন কোনু সত্যকে কোনু উপমার সাহায্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বুঝানো যেতে পারে। দুই, তিনি জানেন কে এ নিয়ামতের হকদার এবং কে নয়। যে ব্যক্তি সত্যের আলোর সঙ্কানী নয়, যে ব্যক্তি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে নিজের পার্থিব স্বার্থেরই মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং বস্তুগত স্বাদ ও স্বার্থের সঙ্কানে নিয়ম থাকে তাকে জোর করে সত্যের আলো দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। যার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, সে এর সঙ্কানী ও ঐকান্তিক সঙ্কানী সে-ই এ দান লাভের যোগ্য।

৬৮. কোন কোন মুফাস্সির এ "ঘরগুলো"কে মসজিদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে উন্নত করার অর্থ নিয়েছেন এগুলো নির্মাণ ও এগুলোকে মর্যাদা প্রদান করা। আবার অন্য কতিপয় মুফাস্সির এর অর্থ নিয়েছেন মু'মিনদের ঘর এবং সেগুলোকে উন্নত

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَابٌ بِقِيَعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّهَانَ مَاءً
هَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَهُ رِيحٌ لَّهُ شَيْئًا وَجَلَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْفَهُ حِسَابٌ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلْمٍ يُمِتُ فِي بَحْرٍ حَيٍ يَغْشِيهِ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۝ ظَلَمَتْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۝ إِذَا
أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَهَا ۝ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ۝

কিন্তু যারা কুফরী করে^{১০} তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরণপ্রাপ্তরে মরাচিকা, তৎক্ষণাত্তর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌছুলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না।^{১১} অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অঙ্ককার। ওপরে হেয়ে আছে একটি তরংগ, তার ওপরে আর একটি তরংগ আর তার ওপরে মেঘমালা অঙ্ককারের ওপর অঙ্ককার আচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না।^{১২} যাকে আল্লাহ আচ্ছন্ন আলো দেন না তার জন্য আর কোন আলো নেই।^{১৩}

করার অর্থ তাঁদের মতে সেগুলোকে নেতৃত্ব দিক দিয়ে উন্নত করা। “সেগুলোর মধ্যে নিজের নাম শরণ করার আল্লাহ হকুম দিয়েছেন” এ শব্দগুলো বাহ্যত মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বেশী সমর্থক দেখা যায়। কিন্তু একটি গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে এটি প্রথম ব্যাখ্যাটির মতো এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিরও সমান সমর্থক। কারণ আল্লাহর শরীয়াত বৈরাগ্যবাদগত ধর্মের ন্যায় ইবাদাতকে কেবল ইবাদাতখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। পুরোহিত বা পূজারী শ্রেণীর কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সেখানে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করা যেতে পারে না। বরং এখানে মসজিদের মতো গৃহ ও ইবাদাতখানা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের পুরোহিত। কাজেই এ সূরায় সকল প্রকার ঘরোয়া জীবন যাপনকে উচ্চ ও সমূর্ধত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পরিবেশ ও পরিস্থিতির দিক দিয়ে বেশী উপযোগী বলে আমাদের মনে হচ্ছে, যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটিকে বড় করে দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আমাদের কাছে নেই। বিচিত্র নয়, এর অর্থ হচ্ছে মুমিনদের গৃহ ও মসজিদ দু'টোই।

৬৯. আল্লাহর আসল আলো উপলক্ষি ও তার ধারায় অবগাহন করার জন্য যেসব শুণের প্রয়োজন এখানে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অর্ক বটনকারী নন। যাকে ইচ্ছা এমনি বিনা কারণে তার পাত্র এমনভাবে তরে দেবেন যে, উপরে পড়ে যেতে থাকবে আবার যাকে ইচ্ছা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন, এটা আল্লাহর বটন নীতি নয়। তিনি

যাকে দেন, দেখেগুনেই দেন। সত্ত্বের নিয়ামত দান করার ব্যাপারে তিনি যা কিছু দেখেন তা হচ্ছে : মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ, আকর্ষণ, তয় এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রহণের আকাংখা ও ক্রোধ থেকে বৌঢ়ার অভিলাষ আছে। সে পার্থিব স্বার্থ পূজ্য নিজেকে বিলীন করে দেয়নি। বরং যাবতীয় কর্মব্যস্ততা সঙ্গেও তাঁর সমগ্র হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে থাকে তাঁর মহান প্রতিপাদকের স্ফূর্তি। সে রসাতলে যেতে চায় না বরং কার্যত এমন উচ্চমার্গে উন্নীত হতে চায় যেদিকে তাঁর মালিক তাকে পথ দেখাতে চায়। সে এ দু'দিনের জীবনের শাতের প্রত্যাশী হয় না বরং তাঁর দৃষ্টি থাকে আখেরাতের চিরস্তন জীবনের ওপর। এসব কিছু দেখে মানুষকে আল্লাহর আলোয় অবগাহন করার সুযোগ দেবার ফায়সালা করা হয়। তাঁরপর যখন আল্লাহ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন তখন এত বেশী দিয়ে দেন যে, মানুষের নিজের নেবার পাত্র সংকীর্ণ থাকলে তো তিনি কথা, নয়তো তাঁর দেবার ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা এবং শেষ সীমানা নেই।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ এবং সে সময় আল্লাহর নবী সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্ত্বের শিক্ষা দিচ্ছিলেন সরল মনে তা মেনে নিতে অঙ্গীকার করে। ওপরের আয়াত নিজেই বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আলো লাভকারী বলতে সাক্ষা ও সৎ মুমিনদেরকে বুরানো হয়েছে। তাই এখন তাঁদের মোকাবিলায় এমন সব লোকের অবস্থা জানানো হচ্ছে যারা এ আলো লাভের আসল ও একমাত্র মাধ্যম অর্থাৎ রসূলকেই মেনে নিতে ও তাঁর আনুগত্য করতে অঙ্গীকার করে। মন থেকে অঙ্গীকার করলে অথবা নিছক মৌখিক অঙ্গীকৃতির ঘোষণা দিক কিংবা মনে ও মুখে উভয়ভাবে অঙ্গীকৃতি জানাক তাতে কিছু আসে যায় না।

৭১. এ উপমায় এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা কুফরী ও মুনাফিকী সঙ্গেও বাহ্যত সৎকাজও করে এবং মোটামুটিভাবে আখেরাতকেও মনে আবার এ অসার চিন্তাও পোষণ করে যে, সাক্ষা ঈমান ও মুমিনের গুণবলী এবং রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া এ কার্যাবলী তাঁদের জন্য আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। উপমার আকারে তাঁদেরকে জানানো হচ্ছে, তোমরা নিজেদের যেসব বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলক সৎ-কাজের মাধ্যমে আখেরাতে লাভবান হবার আশা রাখো সেগুলো নিছক মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত তাকে একটি তরংগায়িত পানির দরিয়া মনে করে নিজের পিপাসা নিরুত্তির জন্য উর্ধশাসে সেদিকে দৌড়াতে থাকে, ঠিক তেমনি তোমরা এসব কর্মের ওপর মিথ্যা তরসা করে মৃত্যু মনযিলের পথ অতিক্রম করে চলছো। কিন্তু যেমন মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যখন যে স্থানে পানির দরিয়া আছে মনে করেছিল সেখানে পৌছে কিছুই পায় না ঠিক তেমনি তোমরা যখন মৃত্যু মনযিলে প্রবেশ করবে তখন জানতে পারবে সেখানে এমন কোন জিনিস নেই যা থেকে তোমরা লাভবান হতে পারবে। বরং এর বিপরীত দেখবে তোমাদের কুফরী ও মুনাফিকী এবং লোকদেখানো সৎকাজের সাথে তোমরা যেসব খারাপ কাজ করছিলে সেগুলোর হিসেব নেবার এবং পুরোপুরি প্রতিদান দেবার জন্য আল্লাহ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

৭২. এ উপমায় সকল কাফের মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। লোক দেখানো সৎকাজকারীরাও এর অত্তরভূক্ত। এদের সবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, জাগতিক পরিভাষায়

الْمَرْءُ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطِيرُ صَفَتٌ
 كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يَفْعَلُونَ ④٥٠ وَلِلَّهِ مُلْكٌ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ④٥١ الْمَرْءُ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي
 سَحَابَاتِهِ يَؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رَكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
 مِنْ خَلْلِهِ ۚ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِّ دِفَصِيبٍ
 بِهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَصِرِّفُهُ عَنْ مِنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَابِرُ قِهْيَنْ هَبْ
 بِالْأَبْصَارِ ④٥٢

৬ রূক্ত

তুমি^{۷۸} কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে? প্রত্যেকেই জানে তার নামায়ের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ যেসমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর তার খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুন্নত পাহাড়গুলোর বদৌলতে^{۷۵} শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুৎচমক চোখ ধৌধিয়ে দেয়।

তারা মহাপঞ্জিত ও জ্ঞান সাগরের মহান দিশারী হলেও হতে পারে কিন্তু নিজেদের সমগ্র জীবন যাপন করছে তারা চরম ও পূর্ণ মূর্খতার মধ্যে। তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো যে এমন কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে যেখানে পুরোপুরি অঙ্কুরারের রাজত্ব, আলোর সামান্যতম শিখাও যেখানে পৌছুতে পারে না। তারা মনে করে আনবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, শব্দের চেয়ে দ্রুত গতি সম্পর্ক বিমান এবং চাঁদে ও গ্রহস্তরে পাড়ি দেবার জন্য মহাশূন্য যান তৈরী করার নাম জ্ঞান। তাদের মতে, খাদ্য নীতি, অর্থনীতি,

يَقْلِبُ اللَّهُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَا وَلِيَ الْأَبْصَارِ^{৪৪}
 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ
 اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{৪৫} لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْ
 مُبِينَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^{৪৬} وَيَقُولُونَ
 أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فِرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ^{৪৭}

তিনিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাছেন। দৃষ্টিস্পর্শদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটিশিক্ষা।

আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্টকে এক ধরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর দিয়ে, কেউ চলছে দু'পায়ে হেঁটে আবার কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান পয়দা করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

আমি পরিকার সত্য বিবৃতকারী আয়াত নাযিল করে দিয়েছি তবে আল্লাহই যাকে চান সত্য সরল পথ দেখান।

তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মু'মিন নয়।^{৭৬}

আইন শাস্তি ও দর্শনে পারদর্শিতা অর্জন করার নাম জ্ঞান। কিন্তু আসল জ্ঞান এর থেকে সম্পূর্ণ তির জিনিসের নাম। তার স্পর্শ থেকে তারা অনেক দূরে রয়ে গেছে। সেই জ্ঞানের দৃষ্টিতে তারা নিছক মুর্খ ও অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো যদি সত্যকে চেনে ও উপলক্ষ করে তাহলে সে জ্ঞানবান।

৭৩. এখানে পৌছে আসল কথা, পরিকার করে বলে দেয়া হয়েছে। এর সূচনা করা হয়েছিল **اللَّهُ نَزَّلَ السُّمُوتَ وَالْأَرْضَ** থেকে। বিষ-জাহানে যখন মূলত আল্লাহর আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই এবং সে আলো থেকেই হচ্ছে যাবতীয় সত্যের

وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
مُعْرَضُونَ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ أَحْقَلُ يَاتُوا إِلَيْهِ مِنْ عِنْدِنِي ۝ ۱۰۵
قُلْ لَوْبِهِمْ مَرْضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَرَسُولُهُ ۝ بَلْ أُولُئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۰۶

যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে, যাতে রসূল তাদের পরম্পরের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দেন।^{৭৭} তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়।^{৭৮} তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রসূলের কাছে আসে।^{৭৯} তাদের মনে কি (মুনাফিকীর) রোগ আছে? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা তার করছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুক্ত করবেন? আসলে তারা নিজেরাই যানেম।^{৮০}

প্রকাশ তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আলো পাবে না সে পূর্ণ ও নিষ্ঠিত অন্ধকারে ঢুবে থাকবে না তো আর কি হবে? আর কোথাও তো আলো নেই। কাজেই অন্য কোথাও থেকে আলোর একটি শিখাও লাভ করার সংভাবনা কারো নেই।

৭৪. উপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আলো কিন্তু একমাত্র সৎ মুহিমন্ডলাই এ আলো লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, বাদবাকি সব লোকেরাই এ পূর্ণাংশ আলোর দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও ঘোর অন্ধকারে অবের মতো হাতড়ে মরে। এখন এ আলোর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অসংখ্য নির্দশনের মধ্যে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি এখানে পেশ করা হচ্ছে। মনের চোখ খুলে কেউ সেগুলোর দিকে তাকালে সবসময় সবদিকে আল্লাহকেই সক্রিয় দেখতে পাবে। কিন্তু যাদের মনের চোখ অন্ধ তারা কপালের দুটো চোখ বিফরিত করে দেখলেও জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন রকম বিদ্যা তাদের চোখে তালোমতোই সক্রিয় রয়েছে বলে তাদের চোখে ঠেকবে কিন্তু আল্লাহকে কোথাও সক্রিয় দেখতে পাবে না।

৭৫. এর অর্থ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মেঘপুঁজেও হতে পারে ক্লপক অর্থে একেই হয়তো আকাশের পাহাড় বলা হয়েছে। আবার পৃথিবীর পাহাড়ও হতে পারে, যা শূন্যে যাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর ছড়ায় জমে থাকা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এত বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, মেঘমালা জমে গিয়ে শিলা বৃষ্টি হতে থাকে।

৭৬. অর্থাৎ আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। তাদের এহেন কার্যকলাপ থেকে বুঝা যায় যে, তারা যখন বলেছে আমরা ঈমান এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করেছি তখন তারা অসত্য বলেছে।

৭৭. এ শব্দগুলো পরিষ্কার মানিয়ে দিছে, রসূলের ধর্মসমাজ হচ্ছে আল্লাহর ফার্মস্যা এবং তাঁর হকুম আল্লাহরই হকুমের নশ্বরের মাত্র। রসূলের দিকে আহবান করা নিউক রসূলের দিকেই আহবান করা নয় বরং আল্লাহ ও রসূল উভয়েরই দিকে আহবান করা। তাহাত্তা এ আয়াতটি এবং গুপ্তের আয়াতটি থেকে একই নিসদেহে পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ ও রসূলের অনুগত্য হাত্তা ইমানের দাবী অর্থেইন এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের এ হাত্তা এখন অর্থ নেই যে, মুসলিমান ব্যক্তি ও তেতি হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া আহনের অনুগত হবে সে যদি এ কর্মনীতি অবসরণ শা করে, তাহলে তাঁর ইমানের দাবী একটি মুনাফিকী দাবী হাত্তা আর কিউই নয়। (তুলনামূলক অধ্যয়নের অন্য সূরা নিম্ন ১৯-১২ টিকা সহকারে দেখুন।)

৭৮. উল্লেখ্য, এ বাপারটি কেবল মাত্র নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেরই অন্য ছিল না বরং তাঁর পর হিনিই ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক্ষেত্রে পদে আসার থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সূরাত অনুযায়ী ধর্মসমাজ দেন তাঁর আদাখতের সমন হচ্ছে আসলে আল্লাহ ও রসূলের আদাখতের সমন এবং যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে মৃত তা থেকে নয় বরং আল্লাহ ও রসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মুরসল ইন্দিমে এ বিষয় এ বাচ্চাই বর্ণিত হয়েছে। হাসান বস্তী রহমানুর্গাহে অস্তিত্বে এ হাদিসটি রেজওয়ান করেছেন। হাদিসটি হচ্ছে :

مَنْ دُعَىٰ إِلَىٰ حَكْمٍ مِّنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجْبِ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

“যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের আদাখতের বিচারপতিদের মধ্য থেকে কেনে বিচারপতির কাছে ডাকা হয় এবং সে হাতিয়ে হয় না সে জানেম, তাঁর কোন অধিকার নেই।”
(আহকামুল কুরআন কাস্সাম, ত ৪৩, ৪০৫ পৃষ্ঠা।)

অন্য কথায় এ ধরনের গোক শাস্তিদাতের যোগ্য আবার এ সংগে তাকে অন্যায়কারী প্রতিপন্থ করে তাঁর বিকল্পে একগুলি ফার্মস্যা দিয়ে দেয়াও নায়সংগত।

৭৯. এ আয়াতটি পরিষারণাবে বর্ণনা করছে যে, শরীয়াতের নাতজনক কথাগুলোকে যে ব্যক্তি সানলে গ্রহণ করে নেয় বিষ্ণু আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু তাঁর স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী হয় তাবে সে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর মোকাবিলায় দুনিয়ার অন্যান্য আইনকে প্রাধান্য দেয়, সে মুমিন নয় বরং মুনাফিক। তাঁর ইমানের দাবী মিথ্যা। কারণ সে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান রাখে না বরং ঈমান রাখে নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ওপর। এ নীতি অবসরণ করে এর সাথে সাথে সে যদি আল্লাহর শরীয়াতের কোন অংশকে মেনেও নেয়, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ধরনের মেনে নেয়ার কোন মুক্তি ও মর্যাদা নেই।

৮০. অর্ধাঁ মানুষের এ কর্মনীতি অবসরণের পেছনে তিনটি সঙ্গাব্য কারণই থাকতে পারে। এক, যে মানুষটি ইমানের দাবীদার সে আসলে ঈমানই আনেনি এবং মুনাফিকী পদ্ধতিতে নিছক ধোকা দেবার এবং মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে অবৈধ খর্বসাত্তের অন্য মুসলিমান হয়েছে। দুই, ঈমান আনা সঙ্গেও তাঁর মনে এ মর্মে সন্দেহ রয়ে গেছে যে, রসূল

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ
بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَن
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ رَبِّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَائِرُونَ ۝
وَأَقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْلًا يَمْنَاهُمْ لَئِنْ أَمْرَتْهُمْ لِيَخْرُجُنُ ۝ قُلْ لَا تَقْسِمُوا
طَاعَةً مَعْرُوفَةً ۝ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۝ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّمَا عَلِيهِ مَا حِيلَ ۝ وَعَلَيْكُمْ مَا حِيلَتْمُ
وَإِن تُطِيعُوهُ تُهْتَلِ ۝ وَأَدْوَمَاعَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

৭ রামকৃষ্ণ

মুমিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আগ্রাহ ও রসূলের দিকে ঢাকা হয়, যাতে রসূল তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা করেন, তখন তারা বলেন, আমরা শুন্গাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের গোকেরাই সফলকাম হবে। আর সফলকাম তারাই যারা আগ্রাহ ও রসূলের হকুম মেনে চলে এবং আগ্রাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

এ মুনাফিকরা আগ্রাহের নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, “আপনি হকুম দিলে আমরা অবশ্যই ঘর থেকে বের হয়ে পড়বো।” তাদেরকে বলো, “কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে।^১ তোমাদের কার্যকলাপ সবক্ষে আগ্রাহ বেথবর নন।^২ বলো, “আগ্রাহের অনুগত হও এবং রসূলের হকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলে তালোভাবে জেনে রাখো, রসূলের ওপর যে দায়িত্বের বোৰা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রসূলই দায়ী এবং তোমাদের ওপর যে দায়িত্বের বোৰা চাপানো হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও ঘৃথহীন হকুম শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।”

আসবে আগ্রাহের রসূল কি না, কুরআন আগ্রাহের কিতাব কি না এবং কিয়ামত সত্যিসত্যিই অনুষ্ঠিত হবে কি না অথবা এগুলো সবই নিছক মুখরোচক গালগঞ্জ বরং আসলে আগ্রাহের অতিত্ব আছে কি অথবা এটাও নিছক একটা কল্পনা, কোন বিশেষ বার্থোঙ্কারের

وَعَلَّ اللَّهِ الَّذِينَ أَمْنَوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ
الَّذِي أَرْتَصَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ نَفْسَيْ
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ^(১)
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الْزَّكُوْةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ^(২)
لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَغْرِبِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَهُمْ بِالنَّارِ
وَلَيُئْسَ الْمَصِيرُ^(৩)

আগ্রাহ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আগ্রাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে।^(১) আর যারা এর পর কুফরী করবে^(২) তারাই ফাসেক। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করণ্গ করা হবে। যারা কুফরী করছে তাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তারা পৃথিবীতে আগ্রাহকে অক্ষম করে দেবে। তাদের আশ্রয়স্থল জাহানাম এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।

উদ্দেশ্যে এ কান্নিক বিষয়টি তৈরী করে নেয়া হয়েছে। তিনি, সে আগ্রাহকে আগ্রাহ এবং রসূলকে রসূল বলে মেনে নেবার পরও তাদের পক্ষ থেকে জুলুমের আশংকা করে। সে মনে করে আগ্রাহর কিতাব অমুক হকুমটি দিয়ে তো আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে এবং আগ্রাহর রসূলের অমুক উক্তি বা অমুক পদ্ধতি আমাদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এ তিনটি কারণের মধ্যে যেটিই সত্য হোক না কেন, মোটকথা এ ধরনের লোকদের জালেম হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের চিন্তা সহকারে যে ব্যক্তি মুসলিমদের দলভুক্ত হয়, ঈমানের দাবী করে এবং মুসলিম সমাজের একজন সদস্য সেজে এ সমাজ থেকে

বিভিন্ন ধরনের অবৈধ স্বার্থ হাসিল করতে থাকে, সে একজন বড় দাগাবাজ, বিশ্বাসঘাতক, খেয়ালতকারী ও জনসিয়াত। সে নিজের উপরও ভুলুম করে। রাত দিন হিয়েচারের মাধ্যমে নিজেকে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষে পরিণত করতে থাকে। সে এমন ধরনের মুসলমানদের প্রতিও যুনুম করে যারা তার বাহ্যিক কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের উপর নির্ভর করে তাকে এ হিন্দুত্বের একটি অংশ বলে মেনে নেয় এবং তারপর তার মধ্যে নানান ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বৈতাক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৮১. বিভিন্ন অর্থ এও হতে পারে, মু'মিনদের থেকে কাংগুত্য অনুগত্য হচ্ছে এমন পরিচিত ধরনের অনুগত্য যা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উৎস থাকে তা এমন ধরনের আনুগত্য নয় যার নিষ্ঠাতা দেবার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন হয় এবং এর প্রয়োজন তার প্রতি অবিশ্বাস থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাহীর আদেশের অনুগত হয় তাদের মনোভাব ও কর্মনীতি গোপন থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কার্যধারা দেখে অনুভব করে, এরা আনুগত্যশীল লোক। তাদের ব্যাপারে এমন কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশই নেই যে, তা দূর করার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন দেখা দেবে।

৮২. অর্থাৎ সৃষ্টির মোকাবিলায় এ প্রতারণ হয়তো সফল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আগ্রাহীর মোকাবিলায় কেমন করে সফল হতে পারে? তিনি তো প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা বরং মনের প্রছর ইচ্ছা, চিন্তা ও আশা-আকাশ্যাও জানেন।

৮৩. এ বক্তব্যের শুরুতেই আমি ইংগিত করেছি, এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আগ্রাহ মুসলমানদের বিলাফত দান করার যে প্রতিশ্রুতি দেন তা নিছক আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসেবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা সাক্ষা ইমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আগ্রাহীর পছন্দনীয় দীনের আনুগত্যকারী এবং সব ধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আগ্রাহীর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের মধ্যে এসব গুণ নেই, নিছক মুখে ইমানের দাবীদার, তারা এ প্রতিশ্রুতিশালের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি দানও করা হয়নি। কাজেই তারা যেন এর অংশীদার হবার আশা না রাখে।

কেউ কেউ খিলাফতকে নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা, রাজ্য শাসন, প্রাধান্য ও প্রতিপন্থি অর্থে গহণ করেন। তারপর আলোচ্য আয়াত থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই এ শক্তি অর্জন করে সে মু'মিন, সৎ, আগ্রাহীর পছন্দনীয় দীনের অনুসারী, আগ্রাহীর বন্দেগী ও দাসত্বকারী এবং শিরক থেকে দূরে অবস্থানকারী। এরপর তারা নিজেদের এ তুল সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রতিপর করার জন্য ইমান, সৎকর্মশীলতা, সত্যদীন, আগ্রাহীর ইবাদাত ও শিরক তথা প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বিবৃত করে তাকে এমন কিছু বানিয়ে দেন যা তাদের এ মতবাদের সাথে খাপ যেয়ে যায়। এটা কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত বিকৃতি। এ বিকৃতি ইহুদী ও খুস্তানদের বিকৃতিকেও ছান করে দিয়েছে। এ বিকৃতির মাধ্যমে কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি অর্থ করা হয়েছে যা সমগ্র কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করে দেয় এবং ইসলামের কোন একটি জিনিসকেও তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। খিলাফতের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর নিশ্চিতভাবে এমন সব লোকের উপর এ আয়াত প্রযোজ্য হয় যারা কখনো দুনিয়ায় প্রাধান্য ও রাষ্ট্রক্ষমতা ধাত করেছে অথবা বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তারা আগ্রাহ, অহী, রিসানাত,

আখেরাত সবকিছু অঙ্গীকারকারী হতে পারে এবং কামেকী ও অশ্লীলতার এমন সব মলিনতায় আপুতও হতে পারে যেগুলোকে কুরআন করীরা গুনাহ তথা বৃহত পাপ গণ্য করেছে, যেমন সূদ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া। এখন যদি এসব লোক সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং এ জন্যই তাদেরকে খিলাফতের উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে, তাহলে এরপর ইমানের অর্থ প্রাকৃতিক আইন মেনে নেয়া এবং সৎকর্মশীলতা অর্থ এ আইনগুলোকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর আল্লাহর পছন্দনীয় দীন বলতে প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে শিল্প, কারিগরী, বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্যাপক উন্নতি লাভ করা ছাড়া আর কি হতে পারে? এরপর আল্লাহর বন্দেগী বলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সাফল্য লাভ করার জন্য যেসব নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রযুক্তিগতভাবে লাভজনক ও অপরিহার্য হয়ে থাকে সেগুলো মেনে চলা ছাড়া আর কি হতে পারে? তারপর এ লাভজনক নিয়ম কানুনের সাথে কোন ব্যক্তি বা জাতি কিছু ক্ষতিকর পক্ষতি অবলম্বন করলে তাকেই শিরুক নামে অভিহিত করা ছাড়া আর কাকে শিরুক বলা যাবে? কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো দৃষ্টি ও মন আচ্ছন্ন না রেখে বুঝে কুরআন পড়েছে সে কি কখনো একথা মেনে নিতে পারে যে, সত্যই কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমান, সৎকাজ, সত্য দীন, আল্লাহর ইবাদাত এবং তাওহীদ ও শিরুকের এ অর্থই হয়? যে ব্যক্তি কখনো পুরো কুরআন বুঝে পড়েনি এবং কেবলমাত্র বিশ্বিল কিছু আয়াত নিয়ে সেগুলোকে নিজের চিন্তা-কর্মনা ও মতবাদ অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে সে-ই কেবল এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অথবা এমন এক ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে, যে কুরআন পড়ার সময় এমন সব আয়াতকে একেবারেই অর্থহীন ও ভুল মনে করেছে যেগুলোতে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ, তাঁর নামিল করা অহীকে পথনির্দেশনার একমাত্র উপায় এবং তাঁর পাঠানো প্রত্যেক নবীকে ছড়ান্ত পর্যায়ে অপরিহার্যভাবে মেনে নেবার ও নেতা বলে ঝীকার করে অনুসরণ করার আহবান জানানো হয়েছে। আর এই সংগে বর্তমান দুনিয়াবী জীবনের শেষে দ্বিতীয় আর একটি জীবন কেবল মেনে নেবারই দাবী করা হয়েনি বরং একথা পরিকার বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা এ জীবনে নিজেদের জবাবদিহির কথা অঙ্গীকার করে বা এ ব্যাপারে সকল প্রকার চিন্তা বিমুক্ত হয়ে নিছক এ দুনিয়ায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে তারা চূড়ান্ত সাফল্য থেকে বাস্তিত থাকবে। কুরআনে এ বিষয়কস্তুগুলো এত বেশী পরিমাণে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সুস্পষ্ট ও ঘৰ্থহীন ভাষায় বারবার বলা হয়েছে যে, খিলাফতলাভ সম্পর্কিত এ আয়াতের এ নতুন ব্যাখ্যাতাগণ এ ব্যাপারে যে বিভাসির শিকার হয়েছেন, যথার্থ সততা ও আন্তরিকতার সাথে এ কিভাব পাঠকারী কোন ব্যক্তি কখনো তার শিকার হতে পারেন, একথা মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থ খিলাফত ও খিলাফতলাভের যে অর্থের উপর তারা নিজেদের চিন্তার এ বিশাল ইমারত নির্মাণ করেছেন তা তাদের নিজেদের তৈরী। কুরআনের জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো এ আয়াতের এ অর্থ করতে পারেন না।

আসলে কুরআন খিলাফত ও খিলাফতলাভকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। প্রত্যেক জায়গায় পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় থেকে কোথায় এ শব্দটি কি অর্থে বলা হয়েছে তা জানা যায়।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, “আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া!” এ অর্থ অনুসারে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানব সন্তান পৃথিবীতে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, “আল্লাহর সর্বেচ কর্তৃতু মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়তী বিধানের (নিচক প্রাকৃতিক বিধানের নয়) অবতার খিলাফতের ক্ষমতা ব্যবহার করা।” এ অর্থে কেবলমাত্র সৎয়মিনই খলীফা গণ্য হয়। কারণ সে সঠিকভাবে খিলাফতের হক আদায় করে। বিপরীত পক্ষে কাফের ও ফাসেক খলীফ নয় বরং বিদ্রোহী। কারণ তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাকে নাফসুমানীর পথে ব্যবহার করে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, “এক ধূগের বিভিন্ন ও ক্ষমতাশালী জাতির পক্ষে অন্য জাতির তার হান দখল করা।” খিলাফতের প্রথম দু’টি অর্থ গৃহীত হয়েছে “প্রতিনিধিত্ব” শব্দের অনুনিহিত অর্থ থেকে। আর এ শেষ অর্থটি “সূজাতিভিক্রি” শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এ শব্দটির এ দু’টি অর্থ আরবী ভাষায় সর্বজন পরিচিত।

এখন যে বাক্তিই এখানে এ প্রেক্ষণটে খিলাফতাতের আয়াতটি পাঠ করবে সে এক মুহূর্তের জন্যও এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এখানে খিলাফত শব্দটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবহার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আল্লাহর শরীয়তী বিধান অনুযায়ী (নিচক প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নয়) তাঁর প্রতিনিধিত্বের যথার্থ হক আদায় করে। এ কারণেই কাফের তো দূরের কথা ইসলামের দাবীদার মুনাফিকদেরকেও এ প্রতিশ্রূতিতে শরীক করতে অশ্বিনূতি জানানো হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে, একমাত্র সিমান ও সংকর্মের গুণে গুণবিত্ত গোকেরাই হয় এর অধিকারী। এ জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফল হিসেবে বলা হচ্ছে, আল্লাহর পছন্দনীয় দীন অর্থাৎ ইসলাম মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর এ জন্য এ পূরুষার দানের শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, নির্ভেজল আল্লাহর বল্দেগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ধাকো। এ বল্দেগীতে যেন শিরকের সামাজ্যতমান মিশেল না থাকে। এ প্রতিশ্রূতিকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্তর্জাতিক যয়দানে পৌছিয়ে দেয়া এবং অংমেরিকা থেকে নিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত যাই শ্রেষ্ঠতু ও প্রতাপ-পতিপন্ডির উৎকা দুলিয়ায় বাজতে থাকে তারই সমষ্টিপে একে নজরানা হিসেবে পেশ করা চূড়ান্ত মূর্তা হাড়া আর কিছুই নয়। এ শক্তিশালো যদি খিলাফতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে থাকে তাহলে ফেরাউন ও নমরদ কি দোষ করেছিল, আল্লাহ কেন তাদেরকে অভিশাপনাতের যেগো গণ্য করেছেন? (অরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, অন্ত আবিয়া, ১৯ টীকা।)

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকলের মুসলমানদের জন্য এ প্রতিশ্রূতি পরোক্ষভাবে পৌছে যায়। প্রত্যক্ষভাবে এখানে এমন সব গোককে সংশোধন করা হয়েছিল যার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুন্থে হিলেন। প্রতিশ্রূতি যখন দেখা হয়েছিল তখন সত্যেই মুসলমানরা তহ-তীতির মধ্যে অবস্থান করছিল এবং নীন ইসলাম তখনে হিজয়ের সরকারিনে মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেনি। এর কয়েক বছর পর এ তহতীতির অবস্থা কেবল নিরাপত্তায় বদলে যায়নি বরং ইসলাম আরব থেকে বের হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শিকড় কেবল তার জন্মভূমিতেই নয়, বহির্বিশ্বেও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রূতি অবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারান্দ ও উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহামের জামানায় পুরা

করে দেন, এটি একথার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। এরপর এ তিন মহান ব্যক্তির খিলাফতকে কুরআন নিজেই সভ্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ নিজেই এদের সৎমুমিন হবার সাক্ষ দিচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করা কঠিন। এ ব্যাপারে যদি কারোর মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাঁর “নাহজুল বালাগাহ” সাইয়েদুনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহর ভাষণ পাঠ করা দরকার। হযরত উমরকে ইরানীদের বিরুদ্ধে সশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি এ ভাষণটি দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেন : এ কাজের বিষ্টার বা দুর্বলতা সংখ্যায় বেশী হওয়া ও কম হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর দীন। তিনি একে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করেছেন। আর আল্লাহর সেনাদলকে তিনি সাহায্য-সহায়তা দান করেছেন। শেষ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে তা এখানে পৌছে গেছে। আল্লাহ নিজেই আমাদের বলেছেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُشَتَّرِخُ فَنُهُمْ فِي

الْأَرْضِ

আল্লাহ নিজেই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিজেই নিজের সেনানীদেরকে সাহায্য করবেন। মোতির মালার মধ্যে সূতোর যে হান, ইসলামে কাইয়েম তথা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারীও সে একই হানে অবস্থান করছেন। সূতো ছিড়ে পেলেই মোতির দানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শুখলা বিনষ্ট হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার একজ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই, আরবরা সংখ্যায় অজ। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় পরিগত করেছে এবং সংবন্ধতা তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। আপনি কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবে এখানে শক্ত হয়ে বসে থাকুন, আরবের যৌতাকে নিজের চারদিকে ঘূরাতে থাকুন এবং এখানে বসে বসেই যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে থাকুন। নয়তো আপনি যদি একবার এখান থেকে সরে যান তাহলে সবদিকে আরবীয় ব্যবস্থা জেহে পড়তে শুরু করবে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছুবে যে, আপনাকে সামনের শক্তির তুলনায় পেছনের বিপদের কথা বেশী করে চিন্তা করতে হবে। আবার উদিকে ইরানীরা আপনার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করবে। তারা মনে করবে, এই তো আরবের মূল গ্রহী, একে কেটে দিলেই ল্যাঠ ছুকে যায়। কাজেই আপনাকে খতম করে দেবার জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়েগ করবে। আর আজমবাসীরা এ সময় বিপুল সংখ্যায় এসে তীড় জমিয়েছে বলে যে কথা আপনি বলেছেন এর জবাবে বলা যায়, এর আগেও আমরা তাদের সাথে লড়েছি, তখনো সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লড়িনি বরং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তাই আজ পর্যন্ত আমাদের সফলকাম করেছে।”

জানী পর্যবেক্ষক নিজেই দেখতে পারেন হযরত আলী (রা) এখানে কাকে খিলাফতলাতের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করছেন।

৮৪. এখানে কুফৰী করা মানে নিয়ামত অবীকার করাও হতে পারে আবার সভ্য অবীকার করাও। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে এমন সব লোক যারা খিলাফতের নিয়ামত লাভ করার পর সত্য পথ থেকে বিচুত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে মুনাফিকবৃন্দ, যারা আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি শুনার পরও নিজের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতি পরিহার করে না।

يَا يَهَا أَلِّيْنِ يَنْ مُنَوْا لِيْسْتَأْذِنْكُمْ أَلِّيْنِ يَنْ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحَلْمَ مِنْكُمْ ثُلَثَ مَرِّيْتِ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثُلَثَ
عُورَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدَ هُنَ طَوْفُونَ
عَلَيْكُمْ بِعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كُلُّ لَكَ يَبْيَسْ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيْتِ وَالله

عليهم حكيم

৪ রক্ত

হে ইমানদারগণ।^{৮৫} তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী^{৮৬} এবং তোমাদের এমন সব স্তান যারা এখনো বুদ্ধির সীমানায় পৌছেনি,^{৮৭} তাদের অবশ্য তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত : ফজ্জরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়।^{৮৮} এরপরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের কোন শুনাই নেই এবং তাদেরও না।^{৮৯} তোমাদের পরম্পরের কাছে বারবার আসতেই হয়।^{৯০} এভাবে আগ্নাহ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সৃষ্টিভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

৮৫. এখান থেকে আবার সামাজিক বিধানের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হচ্ছে। সূরা নূরের এ অংশটি শুণের ভাষণের কিছুকাল পরে নাযিল হওয়া মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়।

৮৬. অধিকাংশ মুফাসসির ও ফকীহের মতে “মালিকানাধীন” বলতে দাসদাসী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ এখনে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে উমর ও মুজাহিদ এ আয়াতে মামলুক তথা মালিকানাধীন শব্দটি কেবলমাত্র দাস অর্থে নিয়েছেন। তাঁরা দাসীকে এর বাইরে রেখেছেন। অর্থে সামনের দিকে যে হকুম বর্ণনা করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে এ বিশেষ অর্থের কোন কারণ দেখা যায় না। একান্তে অবস্থান করার সময় যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের অক্ষয়ত এসে যাওয়া সংগত নয় তেমনি দাসী-চাকরানীর এসে যাওয়াও অসংগত।

এ আয়াতের আদেশ প্রাণ-বয়স্ক-অপ্রাণ-বয়স্ক উভয় ধরনের দাসদাসীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এ ব্যাপারে সবাই একমত।

০

০

৮৭. হিতীয় অনুবাদ হতে পারে, “প্রাণ বয়স্কদের মতো স্বপ্ন দেখার বয়সে পৌছেনি।” এ থেকেই ফকীহগণ স্বপ্নদোষকে ছেলেদের বয়ঃপ্রাণ হবার সূচনা বলে মেনে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু আমি নিজে মূল অনুবাদে যে অর্থ করেছি তা অগ্রগণ্য হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এ হকুমটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য। অন্যদিকে স্বপ্নদোষকে বয়ঃপ্রাণ হবার আলামত হিসেবে গণ্য করার পর হকুমটি শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ মেয়েদের প্রাণ বয়স্ক হবার সূচনা হচ্ছে মাসিক ঝুতপ্রাব, স্বপ্নদোষ নয়। কাজেই আমার মতে হকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতদিন ঘরের ছেলে মেয়েরা যৌন চেতনা জাগ্রত হবার বয়সে পৌছে না ততদিন তারা এ নিরাম মেনে চলবে। এরপর যখনই তারা এ নির্দিষ্ট বয়সে পৌছে যাবে তখনই তাদের যে হকুম মেনে চলতে হবে তা সামনে আসছে।

৮৮. مُلْكٌ عَوْرَاتٍ (আওরাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “এ তিনটি সময় তোমাদের জন্য আওরাত।” আওরাত বলতে আমাদের ভাষায় মেয়েলোক বা নারী জাতি বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর মানে হয় বাধা ও বিপদের জায়গা এবং যে জিনিসের খুলে যাওয়া মানুষের জন্য লজ্জার ব্যাপার এবং যার প্রকাশ হয়ে পড়া তার জন্য বিরক্তিকর হয় এমন জিনিসের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কোন জিনিসের অসংরক্ষিত হওয়া অর্থেও এর ব্যবহার হয়। এ অর্থগুলো সবই প্রস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত এবং আয়তের অর্থের সাথে কোন না কোন পর্যায়ে সংযুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে এ সময়গুলোতে তোমরা একাকী বা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এমন অবস্থায় থাকো যে অবস্থায় গৃহের ছেলেমেয়ে বা চাকর বাকরদের হঠাতে তোমাদের কাছে চলে যাওয়া সংগত নয়। কাজেই এ তিনি সময়ে তারা যখন তোমাদের নির্জন স্থানে আসতে চায় তখন তাদের পূর্বাহ্নে অনুমতি নেবার নির্দেশ দাও।

৮৯. অর্থাৎ এ তিনি সময় ছাড়া অন্য সময় নাবালক ছেলেমেয়েরা এবং গৃহবাসীর ও গৃহকর্তার মালিকানাধীন গোলাম ও বাঁদীরা সবসময় নারী ও পুরুষদের কাছে তাদের কামরায় বা নির্জন স্থানে বিনা অনুমতিতে যেতে পারে। এ সময় যদি তোমরা কোন অসতর্ক অবস্থায় থাকো এবং তারা অনুমতি ছাড়াই এসে যায় তাহলে তাদের হমকি ধর্মকি দেবার অধিকার তোমাদের নেই। কারণ কাজের সময় নিজেদেরকে এ ধরনের অসতর্ক অবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই বোকায়ি ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তবে যদি তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা সন্তুষ্টি নির্জনবাসের এ তিনি সময় তারা অনুমতি ছাড়াই আসে তাহলে তারা দোষী হবে। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই যদি তোমাদের সন্তান ও গোলাম-বাঁদীদের এ আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ, শিক্ষা না দিয়ে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেরাই গোনাহগার হবে।

৯০. উপরোক্ত তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময় ছোট ছেলেমেয়ে ও গোলাম-বাঁদীদের বিনা হকুমে আসার সাধারণ অনুমতি দেবার এটিই হচ্ছে কারণ। এ থেকে উসুলে ফিকাহের এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শরীয়তের বিধানসমূহ কোন না কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক হকুমের পেছনে নিশ্চিতভাবেই কোন না কোন কার্যকারণ আছেই, তা বিবৃত হোক বা না হোক।

رَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُنْمَ فَلِيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا لَكُمْ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيَسْ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ
يَضْعُنَ نِيَابِهِنَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِرِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِنَ خَيْرَ لَهُنَ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

আর যখন তোমাদের সত্তানরা বৃক্ষির সীমানায় পৌছে যায়।^১ তখন তাদের তেমনি
অনুমতি নিয়ে আসা উচিত যেমন তাদের বড়ৱা অনুমতি নিয়ে থাকে। এভাবে
আগ্রাহ তাঁর আয়াত তোমাদের সামনে সুশ্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু
জানেন ও বিজ্ঞ।

আর যেসব ঘোবন অতিক্রান্ত মহিলা^২ বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি
নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে দেয়,^৩ তাহলে তাদের কোন গোনাহ নেই, তবে শর্ত
হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না।^৪ তবু তারাও যদি নজরালীসতা অবলম্বন
করে তাহলে তা তাদের জন্য ভাগো এবং আগ্রাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

১। অধোৎ সাবলক ইয়ে ধায়, যেমন ৮৭ টীকায় বলা হয়েছে হেলেদের ক্ষেত্রে
স্পুদোষ ও মেয়েদের প্রেতে মাসিক বৃত্তাব থেকেই তাদের সাবলকত্ব শুরু হয়। কিন্তু
যেসব হেলেমেয়ে কোন কারণে বেশী বয়স পর্যন্ত এসব পরিবর্তন মুক্ত থাকে তাদের
ব্যাপারে ফর্কাইগণ বিভিন্ন মত প্রেরণ করেছেন। ইমাম শাফেতী, ইমাম আবু ইউসুফ,
ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আহমাদের মতে এ অবস্থায় ১৫ বছরের হেলেমেয়েকে সাবলক
মনে করা হবে। ইমাম আবু হানিফার একটি উক্তি এর সমর্থন করে কিন্তু ইমামের
বিব্রাত উক্তি হচ্ছে এ অবস্থায় ১৭ বছরের মেয়ে ও ১৮ বছরের হেলেকে সাবলক গণ্য
করা হবে। দুরআন ও ইস্মের গোন বক্তব্য এ দু'টি উক্তি ভিত্তি নয় এবং এর ভিত্তি
গড়ে উঠেছে ফিকাহতিভিক ইজতিহাদের ওপর। কাজেই সারা দুনিয়ায় চিরকালই যেসব
হেলের স্পুদোষ হয়নি ও যেসব মেয়ের ঝাতুস্বাব দেখা দেয়নি তাদের সাবলকত্বের জন্য
১৫ বা ১৮ বছর বয়সকেই যে সীমানা হিসেবে মেনে নেয়া হবে এমন কোন কথা নেই।
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অবস্থা বিভিন্ন হয়।
আসলে, সাধারণত কোন দেশে যেসব বয়সের হেলেমেয়েদের স্পুদোষ ও মাসিক বৃত্তাব
হওয়া শুরু হয় তাদের গড়পত্তা পার্থক্য বের করে নিতে হবে, তারপর যেসব
হেলেমেয়ের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কারণে এ চিহ্নগুলো যথাযথ উপযোগী সময়ে
প্রকাশিত না হয় তাদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ বয়সের ওপর এ গড়পত্তার বৃদ্ধি ধরে

১০ "তাকে সাবালক্তের বয়স গণ্য করতে হবে। যেমন কোন দেশে সাধারণত কমপক্ষে ১২ এবং বেশীর পক্ষে ১৫ বছর বয়সের ছেলের ব্যবহোষ হয়। এ ক্ষেত্রে গড়গড়তা পার্থক্য হবে দেড় বছর। আর অস্থাভাবিক ধরনের ছেলেদের জন্য আমরা সাড়ে ঘোল বছর বয়ঃসীমাকে সাবালক্তের বয়স গণ্য করতে পারবো। এ নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আইনবিদগণ নিজেদের এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি সীমা নির্ধারণ করতে পারেন।

১৫ বছরের সীমার পক্ষে একটি হাদীস পেশ করা হয়। এটি ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, "আমার বয়স ছিল চৌদ্দ, মে সময় শুহুদ যুক্তে অংশ নেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আমাকে পেশ করা হয়। তিনি আমাকে যুক্তে অংশ নেবার অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের যুক্তের সময় আমাকে আবার পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স হয় ১৫ বছর। এ সময় তিনি আমাকে অনুমতি দেন।" (সিহাহে সিন্তা ও মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু দু'টি কারণে এ হাদীসটি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা যেতে পারে না। এক, শুহুদ যুক্ত ও হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং খন্দকের যুক্ত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কথামত ৫ হিজরীর শওয়াল এবং ইবনে সাদের বজ্ঞ্য মতে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। দুটো যুক্তের মধ্যে পুরো দু'বছর বা তার চেয়ে বেশী দিনের ব্যবধান রয়েছে। এখন যদি শুহুদ যুক্তের সময় ইবনে উমরের বয়স হয় ১৪ বছর তাহলে কেমন করে খন্দকের যুক্তের সময় তা শুধুমাত্র ১৫ বছর হয়?" হতে পারে তিনি ১৩ বছর ১১ মাস রয়সে ১৪ বছর এবং ১৫ বছর ১১ মাসকে ১৫ বছর বলেছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যুক্তের জন্য সাবালক ইওয়া এক জিনিস এবং সামাজিক ব্যাপারের জন্য আইনগতভাবে সাবালক ইওয়া অন্য জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে কোন অনিবার্যতার সম্পর্ক নেই। কাজেই এদের একটিকে অন্যটির জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঢ় করানো যেতে পারে না। তাই যেসব ছেলের ব্যবহোষ হয়নি তাদের সাবালক্তের জন্য ১৫ বছর বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা একটি আনুমানিক ও ইঞ্জিহাদী সিদ্ধান্ত, কুরআন ও হাদীসের হকুম নয়, এ ব্যাপারে এটিই সঠিক কথা।

১২. মূলে বলা হয়েছে قواعد من النساء "অর্থাৎ মহিলাদের মধ্য থেকে যারা বসে পড়েছে" অথবা "বসে পড়া মহিলারা।" এর অর্থ হচ্ছে, হতাশার বয়স অর্থাৎ মহিলাদের এমন বয়সে পৌছে যাওয়া যে বয়সে আর তাদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না। যে বয়সে তার নিজের যৌন কামনা মৃত হয়ে যায় এবং তাকে দেবে পুরুষদের মধ্যেও কোন যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। পরবর্তী বাক্য এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

১৩. মূল শব্দ হচ্ছে يَضْعُفُنَ شَيَّابِهِنْ "নিজেদের কাপড় নামিয়ে রাখে।" কিন্তু এর অর্থ সমস্ত কাপড় নামিয়ে উল্লেখ হয়ে যাওয়া তো হতে পারে না। তাই সকল মুকাস্সির ও ফকীহ সর্বসম্মতভাবে এর অর্থ নিয়েছেন, এমন চাদর যার সাহায্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য শুরু করা হকুম সূরা আহমাদের جلابِيَّهُنْ مِنْ عَلَيْهِنْ আয়াতে দেয়া হয়েছিল।

১৪. মূল শব্দ হচ্ছে غَيْرِ مُتَبَرِّجَتْ بِزِينَةٍ "সৌন্দর্য সহকারে সাজসজ্জা প্রকাশকারী হয় না।" তবে মানে হচ্ছে প্রকাশ ও প্রদর্শনী করা। তবে বলা হয় এমন যৌন নৌকা বা জাহাজকে যার উপরে ছাদ হয় না। এ অর্থে মহিলাদের জন্য এ শব্দটি তখনই বলা হয় যখন তারা পুরুষদের সামনে তাদের নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে। কাজেই

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوِتِكُمْ أَوْ بَيْوِتِ أَبَائِكُمْ
 أَوْ بَيْوِتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بَيْوِتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيْوِتِ أَخْوَتِكُمْ
 أَوْ بَيْوِتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيْوِتِ عُمَّتِكُمْ أَوْ بَيْوِتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ
 بَيْوِتِ خَلِيلِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مِنْ فَاتِحَةٍ أَوْ صَلِيقَةٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جَنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جِيمِيعاً وَأَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيْوِتًا فَسِلِّمُوا عَلَى
 أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَنْ لِكَ يَبْيَنَ اللَّهُ لَكُمْ
 الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

কোন অঙ্গ, খঙ্গ বা রঞ্জ (যদি কারোর গৃহে থেয়ে নেয় তাহলে) কোন ক্ষতি নেই, আর তোমাদের কোন ক্ষতি নেই নিজেদের গৃহে থেলে অথবা নিজেদের বাপ-দাদার গৃহে, নিজেদের মা-নানীর গৃহে, নিজেদের ভাইয়ের গৃহে, নিজেদের বোনের গৃহে, নিজেদের চাচার গৃহে, নিজেদের ফুফুর গৃহে, নিজেদের মামার গৃহে, নিজেদের খালার গৃহে অথবা এমন সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে সোপন করে দেয়া হয়েছে কিংবা নিজেদের বকুলের গৃহে। ১৫ তোমরা এক সাথে খাও বা আলাদা আলাদা, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ১৬ তবে গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে কল্যাণের দোয়া, বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে দেবার এ অনুমতি এমন সব বৃক্ষদেরকে দেয়া হচ্ছে যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শব্দ খতম হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি স্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে সাত্ত্বান হওয়া যেতে পারে না।

১৫. এ আয়াতটি বুঝতে হলে তিনটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত এ আয়াতটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি রঞ্জ, খঙ্গ, অঙ্গ ও অনুরূপ অন্যান্য অক্ষমদের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
 جَاءُ مَعَهُمْ مِّنْ هَبَوْا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
 أُولَئِنَّكَ الَّذِينَ يَرَوْنَكَ مِنْ نَّفْسِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا سَتَأْذِنُوكَ لِيَعْصِي
 شَاءَنِيمُرْ فَإِذَا ذَنَ لَمْ شَتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ

৭৪. ১৮
غَفُور رَحِيم

৯. রূক্তি

মু'মিনোঁ তো আসলে তারাই যারা অতর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানে এবং যখন কোন সামষ্টিক কাজে রসূলের সাথে থাকে তখন তার অনুমতি ছাড়া চলে যায় না।^১ যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাসী। কাজেই তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়^২ তখন যাকে চাও তুমি অনুমতি দিয়ে দাও^৩ এবং এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করো।^৪ আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও করণ্যাময়।

অংশটি সাধারণ লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কুরআনের নৈতিক শিক্ষাবলীর মাধ্যমে আরববাসীদের মন-মানসে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সে কারণে হালাল-হারাম ও জায়ে-নাজায়েয়ের পার্থক্যের ব্যাপারে তাদের অনুভূতি হয়ে উঠেছিল চরম সংবেদনশীল। ইবনে আবুসের উকি অন্যায়ী আল্লাহ যখন তাদের হকুম দিলেন : তখন লোকেরা একে অন্যের সম্পদ নাজায়েয় পথে খেয়ো না।^৫ (একে অন্যের সম্পদ নাজায়েয় পথে খেয়ো না) তখন লোকেরা একে অন্যের বাড়িতে খাবার ব্যাপারেও খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে সাগলো। এমনকি যতক্ষণ গৃহ মালিকের দাওয়াত ও অনুমতি একেবারে আইনগত শর্ত অন্যায়ী না হতো ততক্ষণ তারা মনে করতো কোন আজীব ও বস্তুর বাড়িতে খাওয়াও জায়েয় নয়। তৃতীয়ত এখনে নিজেদের গৃহে খাবার যে কথা বলা হয়েছে তা অনুমতি দেবার জন্য নয় বরং একথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেবার জন্য যে, নিজের আজীব ও বস্তুদের বাড়িতে খাওয়াও চিক তেমনি যেমন নিজের বাড়িতে খাওয়া। অন্যথায় একথা সবাই জানে, নিজের বাড়িতে খাবার জন্য কারোর অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল না। এ তিনটি কথা বুঝে নেয়ার পর আয়াতের এ অর্থ সুল্পষ্ট হয়ে যায় যে, অক্ষম ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য প্রত্যোক গৃহে ও প্রত্যোক জায়গায় থেতে পারে। তার অক্ষমতাই সমগ্র সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাই যেখান থেকেই সে খাবার জিনিস পাবে তা তার জন্য জায়েয় হবে। আর সাধারণ লোকের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের জন্য

১০। তাদের নিজেদের গৃহ এবং যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের গৃহ সমান। তার মধ্যে যেখানেই তারা থাক না কেন সে জন্য পৃথিবীর যথারীতি অনুমতি পেলে তবে থাবে, অন্যথায় তা অবিশ্বাস্তা ও আত্মসাত বলে গণ্য হবে, এ ধরনের কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। সোকেরা যদি তাদের মধ্য থেকে কাঠোর গৃহে যায়, সেখানে গৃহস্থী উপস্থিত না থাকে এবং তার ছাঁ-ছেলেমেয়েরা কিছু খাবার নিয়ে আসে তাহলে তারা নিসৎকোচে তা খেতে পারে।

যেসব আজ্ঞায়-পরিজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সন্তানদের উল্লেখ এ জন্য করা হয়নি যে, সন্তানদের গৃহ নিজেরই গৃহ হয়ে থাকে।

বকুলদের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে, অন্তরঙ্গ বকুলদের কথা বলা হয়েছে, যাদের অনুগম্ভীতিতে অতিথি বকুলা যদি তাদের সবকিছু খেয়েও চলে যায় তাহলে তারা নারাজ হওয়া তো দূরের কথা উলটো আরো খুশিই হবে।

১৬. প্রাচীন আরবের কোন কোন গোত্রের আচার ও স্নীতিবীতি এই ছিল যে, তারা প্রত্যেকে নিজের জন্য খাবার নিয়ে আলাদা বসে থেতো। তারা সবাই মিলে এক জ্যাগায় বসে খাওয়াটা খারাপ মনে করতো। যেমন হিন্দুরা আজো এটা খারাপ মনে করে। অন্য দিকে কোন কোন গোত্র আবার একাকী খাওয়া খারাপ মনে করতো। এমন কি সাথে কেউ থেতে না বসলে তারা অভূত ধাকতো। এ আয়াতটি এ ধরনের বিধি-নিষেধ খতম করার অন্য নায়িক করা হয়েছে।

১৭. মুসলমানদের জামায়াতের নিয়ম-সূত্রগুলি আগের তুলনায় আরো বেশী শক্ত করে দেবার জন্য এ শেষ নির্দেশাবলী দেয়া হচ্ছে।

১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিক্ষিকগণ এবং ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থার আমীরগণের জন্যও এ একই বিধান। কোন সামগ্রিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা শাস্তি যে কোন সময় মুসলমানদের যখন একত্র করা হয় তখন আমীরের অনুমতি ছাড়া তাদের ফিরে যাওয়া বা ছড়িয়ে পড়া কোনক্রমেই জায়েয় নয়।

১৯. এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া অনুমতি চাওয়া তো আদতেই অবৈধ। বৈধতা কেবল তখনই সৃষ্টি হয় যখন যাবার জন্য কোন প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়।

১০০. অর্ধাঁ প্রয়োজন বর্ণনা করার পরও অনুমতি দেয়া বা না দেয়া রসূলের এবং রসূলের পর জামায়াতের আমীরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি তিনি মনে করেন সামগ্রিক প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহলে অনুমতি না দেবার পূর্ণ অধিকার তিনি রাখেন। এ অবস্থায় একজন মু'মিনের এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

১০১. এখানে আবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার মধ্যে যদি সামান্যতম বাহনাবাজীরও দখল থাকে অথবা সামগ্রিক প্রয়োজনের উপর ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা সক্রিয় থাকে, তাহলে এ হবে একটি গোলাহ। কাজেই রসূল ও তাঁর স্থলাভিক্ষিকের শুধুমাত্র অনুমতি দিয়েই ক্ষাত্ত হলে চলবে না বরং যাকেই অনুমতি দেবেন সংগে একথাও বলে দেবেন যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন।

لَا تَجْعَلُوا دِعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُلَّ عَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قُلْ يَعْلَمُ
 مَالِهِ الَّذِينَ يَتَسَلَّوْنَ مِنْكُمْ لَوْاً ذَاهِبًا فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ
 عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَنْ أَبَابِ الْيَمِّ الْأَلَّا
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُرُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ
 يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْهَا بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

৪৪

হে মুসলমানরা! রসূলের আহবানকে তোমাদের মধ্যে পরম্পরের আহবানের মতো মনে করো না।^{১০২} আল্লাহ তাদেরকে তালো করেই জানেন যারা তোমাদের মধ্যে একে অন্যের আড়ালে চুপিসারে সটকে পড়ে।^{১০৩} রসূলের হস্তমের বিরচিতারণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোন বিপর্যয়ের শিকার না হয়।^{১০৪} অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আঘাত না এসে পড়ে। সাবধান হয়ে যাও, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমরা যে নীতিই অবলম্বন করো আল্লাহ তা জানেন। যেদিন লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা কি সব করে এসেছে। তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

১০২. মূলে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ ডাকা ও আহবান করা হয় আবার দোয়া করাও হয়। তাছাড়া দعاء الرَّسُول এর মানে রসূলের ডাক বা দোয়াও হতে পারে আবার রসূলের আহবানও হতে পারে। এসব বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই সঠিক ও যুক্তিসংগত।

এক : "রসূলের আহবানকে কোন সাধারণ মানুষের আহবানের মতো মনে করো না।"^১ অর্থাৎ রসূলের আহবান অস্বাভাবিক শুনত্বের অধিকারী। অন্য কারোর আহবানে সাড়া দেয়া না দেয়ার বাধীনতা আছে কিন্তু রসূলের আহবানে না গেলে বা মনে ক্ষীণতম সংকীর্ণতা অনুভব করলে ঈমান বিপর হয়ে পড়বে।

দুই : "রসূলের দোয়াকে সাধারণ মানুষের দোয়ার মতো মনে করো না" তিনি খুশী হয়ে দোয়া করলে তোমাদের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন নিয়ামত নেই আর নাকার্জ হয়ে বদদোয়া করলে তার চেয়ে বড় আর কোন দুর্ভাগ্য তোমাদের জন্য থাকবে না।

তিনি : "রসূলকে ডাকা সাধারণ মানুষের একজনের অন্য এক জনকে ডাকার মতো হওয়া উচিত নয়।"^২ অর্থাৎ তোমরা সাধারণ লোকদেরকে যেভাবে তাদের নাম নিয়ে উচ্চবরে ডাকো সেভাবে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকো না। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি চরম শিষ্টাচার ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। কারণ তাঁর প্রতি

সামান্যতম বেআদবীর জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে নিঃশ্বাস পাওয়া যাবে না।

১০৩. মুনাফিকদের আর একটি আলাইত হিসেবে একথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামের সামগ্রিক কাজের জন্য যখন ডাকা হয় তখন তারা এসে যায় ঠিকই কিন্তু এ উপস্থিতি তাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপচন্দনীয় হয়, ফলে কোন রকম গা ঢাকা দিয়ে তারা সরে পড়ে।

১০৪. ইমাম জাফর সাদেক (র) বিপর্যয় অর্থ করেছেন “জালেমদের কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি।” অর্থাৎ যদি মুসলমানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাদের ওপর জালেম ও শৈরাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। মোটকথা এটাও এক ধরনের বিপর্যয় হতে পারে। আর এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ধরনের বিপর্যয় হওয়া সম্ভবপর। যেমন পরম্পরের মধ্যে বিছিরতা, গৃহযুদ্ধ, নৈতিক অবক্ষয়, জামা’আতী ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, রাজনৈতিক ও বন্দুগত শক্তি তেজে পড়া, বিজ্ঞাতির অধীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
